একাত্তরে আমি

মিতালী হোসেন

একাত্তরে আমি

This special digital edition published 2025 with the explicit permission of the author.

Originally published in 2015 by পারিজাত প্রকাশনী.

Special Digital Edition, First Release

Author Contact: https://www.facebook.com/mitali.hossain

Publisher Contact: https://intuitai.org

উৎসর্গ

আম্মা

সৈয়দা ইসাবেলা

ও

আব্বা

আনোয়ার হোসেন রতু

লেখকের কথা

আমি জন্মেছিলাম যুদ্ধের মধ্যে। বেড়ে উঠেছি যুদ্ধকালের মধ্যে। আমার আব্বা-আম্মার সাথে তাদের প্রথম সন্তান হিসেবে পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতা অর্জনের বেদনাময় আনন্দের প্রায় সমান অংশীদার ছিলাম। বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সময়কে সঙ্গী করে বড় হয়েছি। সেই সময়কে আগামীকালের জন্য রেখে যাবার চেষ্টা থেকেই এ লেখা ।

অবশ্য এ লেখার শুরু হয়েছিল স্নেহভাজন মের্তোজার আবদার ও প্রচেষ্টায় । বই আকারে এর শেষ হলো আসলাম সানী ও আমীরুল ইসলামের আগ্রহে । মোর্তোজা আমাকে একরকম জোর করে ’৭১-এর কথা লিখিয়েছিল। ছোট্ট সেই লেখাই আমার বাকি লেখার উৎস। ’৭১-এ যুদ্ধের

শুরুতে আমার বয়স ছিল দশ । আমার লেখায় আমি সেই সময়কেই ধরতে চেষ্টা করেছি। আমার আব্বা সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতু যার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল '৭১-এর অনেক আগে থেকেই। '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে জনগণকে সংগঠিত করেন । তারপর আওয়ামী লীগ কর্মী হিসেবে তার সমগ্র জীবন ও সময়কে উৎসর্গ করেছেন। দেশের জন্য । আব্বা যখন বাইরে সংগ্রাম করেছেন। আম্মা তখন একই সাথে ঘরে ও বাইরে সংগ্বাম করেছেন। আব্বা প্রায়ই যখন জেলে যেতেন সে সময় আম্মা সংসার সামলে পার্টির কাজে যোগ দিয়েছেন। '৬৯-এর গণআন্দোলনে সব মিছিলের প্রথমে থেকেছেন আম্মা। '৭১-এর নির্বাচনে নৌকা পাড়ের শাড়ি পরে আওয়ামী লীগের স্বপক্ষে প্রচার অভিযানেও দিনরাত খেটেছেন। '৭১-এ যুদ্ধের নয় মাস মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে আব্বা যখন অতিব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছেন । আম্মাও কিন্তু তখন বসে ছিলেন না। আম্মা তার স্নেহ মমতা উপদেশ ও সেবা দিয়ে যোদ্ধাদের পাশে দাড়িয়েছেন।

এসব লেখায় আমি শুধু সে কথাই লিখতে চেয়েছি। যা আমার স্মৃতিতে খুবই উজ্জ্বল। এখানে কোনো গল্প নেই। যদি এই লেখাগুলো পড়ে কেউ আমাকে ভুল বোঝেন। তাহলে আমি দুঃখ পাব না। কারণ '৭১-এ শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে আমি যে সত্য অনুভব করেছিলাম। যে সত্য

দেখেছিলাম শুধু তাই লিখেছি। কাউকে বড় বা ছোট করতে চাইনি।

আমার আব্বা-আম্মা বীরযোদ্ধা, যাঁদের জীবনের প্রতিটি দিনই কেটে যায় যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তারপরেও '৭১-এর যুদ্ধে তারা সঙ্গী হয়েছিলেন বাঙালি জাতির। কালের বিচারে এই যুগ প্রতিনিধিদের স্থান কীভাবে নির্ণীত হবে জানি না। তবে আগামীদিনের জন্যই আমার এ লেখা। যদি নতুন দিনের মানুষদের কেউ কখনো পড়ে দেখে। তবে জানতে পারবে এইসব যুগবরদের কথা। যারা তাদের সোনালি যৌবনকাল উৎসর্গ করেছিলেন আগামী প্রজন্মের জন্য।

আমি আমার বীরযোদ্ধা আব্বা-আম্মার গৌরবময় জীবনের জন্য গর্বিত। আর গর্বিত এজন্যও যে তাদের সঙ্গে সেদিন আমিও ছিলাম। আসলাম সানী, আমীরুল ইসলাম ও প্রকাশকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমার লেখাগুলোকে গ্রন্থাকারে রূপ দেয়ার জন্য।

মিতালী হোসেন

১ ফেব্রুয়ারি ২০০০

মুখবন্ধ

১৯৭১ সালে যেসব বাঙালির বোঝার মতো বয়স হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকেরই বলবার মতো কিছু কথা আছে। মিতালী হোসেন তখন একেবারেই বালিকা-নাবালিকা বলাই উচিত। কিন্তু রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হওয়ায় এমন সব ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তাকে তখন যেতে হয়েছে যা তার স্মৃতিভাণ্ডারে চিরকালের মতো সঞ্চিত হয়ে গেছে। 'একাত্তরে আমি' তেমনি খণ্ডচিত্রের সঙ্কলন। এর দুটি ছাড়া আর সবই ১৯৭১ সালের ছবি। বাস্তু ছেড়ে ভারতের পথে যাত্রার সময়ে ডাকাতের সর্দারের বাড়িতে আপ্যায়ন, দরিদ্র মাঝির সততা ও শুভেচ্ছা, সীমান্ত পেরোবার সময়ে বাবার রুমালে দেশের এক মুঠো মাটি তুলে নেওয়া, শরণার্থী-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অন্তঃসত্ত্বা

পত্নী রেখে কারো মুক্তিযুদ্ধ করতে চলে যাওয়া, ধর্ষিতা সন্তানসম্ভবা ক্ষতবিক্ষত একটি মেয়েকে দেখে লেখিকার নিরীহ ছোটবেলার অবসান ঘটা-এমন মানবিক দলিলে বইটি পরিপূর্ণ । আবার সেই দুঃসময়ের কোনো জনপ্রতিনিধি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন কিংবা নারকেল তেলের দাম বেশি হওয়ার অজুহাতে পার্লারে গিয়ে কোনো মহিলার চুল বব করে কেটে ফেলা অথবা লেখিকারই আপনজনের পক্ষে সুসজ্জিত হয়ে শরণার্থী শিবিরের কাছে দোকান খোলা-মানবজীবনের অন্যরকম প্রবৃত্তির পরিচয়ও এতে লেখা আছে। মফস্বলের আওয়ামী লীগ অফিসের এক পিয়নের ইচ্ছাপূরণের জন্যে তকে বঙ্গবন্ধুর হেলিকপ্টারে নেওয়া এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে তার দলের অনেকে যখন ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে, তখন সেই পিয়নটির পক্ষে একাকি আওয়ামী লীগ অফিসে মোমবাতি জ্বেলে বসে থাকা-এসব মহত্ত্বের গল্পও এতে আছে। শ্রদ্ধেয় আত্মীয় যখন পাকিস্তানি ঘাতকদের সঙ্গে হাত মেলান, তখন তাকে আর আপন ভাবতে না পারার দুঃখ, সে-ও তো কম মানবীয় নয়। মিতালী হোসেন সরল ও নিরলঙ্কৃত ভাষায় মনের গভীর থেকে এসব খাত আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন।

‘একাত্তরে আমি’ পড়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাসই ফিরে আসে । যদিও তার স্বার্থপরতার কথা ভুলেন না লেখক, কিন্তু আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যয়ই জাগান যে, স্বাধীনতার জন্যে যে ত্যাগ সেদিন বাঙালি করেছিল, তা

ক্ষণিকের ভাববিলাস ছিল না। একাত্তরের আমিরা হারিয়ে যাওয়ার নয়, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার নয়। তাদের মিছিল দীর্ঘ, অস্তিত্ব দেশময়। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তে, নদী-নালায়। তাদের শেষ নেই, যেমন শেষ নেই তাদের নিয়ে গল্প বলার। আমি মিতালী হোসেনের কল্যাণ কামনা করি, তার লেখনী জয়যুক্ত হোক।

আনিসুজ্জামান

৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

৩২ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস

ঢাকা-১০০০

কবে থেকে যুদ্ধের শুরু

আমি জন্মেছিলাম এমন একটা পরিবারে যেখানে ’৭২ এর অনেক আগে থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব প্রবল ছিল। জন্মাবধি আমরা একটা সংগ্রামী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার আব্বা তখন সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়ে কখনো আন্তারগ্রাউন্ডে। আমাদের জীবন ছিল খানিকটা যাযাবরের। কখনো আমার মায়ের আলাদা ছোটখাট সংসারে। কখনো দাদার বৃহৎ বিশৃঙ্খল প্রাচুর্যে ভরপুর সংসারে। আবার কখনো নানার বাড়িতে মামাদের শত্তিময় দরিদ্র সংসারে ঠাই হতো আমাদের। আবার একটা মাঝামাঝি অবস্থাও ছিল। আমাদের ভাইবোনেরা কেউ দাদীর কাছে। কেউ মামীর কাছে। আমার বা একবার দাদার বাড়ি। একবার নানার বাড়ি। আব্বা হয়তো জেলে। নয় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। এই যে বছর ধরে আমরা বাবা-মা ছাড়া ভাইবোনেরা এক একজন এক এক জায়গায়। এ কি '৭১-এর যুদ্ধ থেকে কম?

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, '৭১-এর যুদ্ধ বড় তাড়তাড়ি শেষ হয়েছে। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে স্বাধীনতা পাওয়ায় আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারছি না। বুঝতে পারছি না স্বাধীনতার দাম। মাত্র নয় মাসের যুদ্ধ বলে আজও স্বাধীনতার শত্রুরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পায়। এসব কথা কিন্তু শুনে আসছি সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। আজকাল আবার নতুন করে কথাগুলো আমায় ভাবাচ্ছে। এর একটা কারণ, দীর্ঘকাল পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। তারপরেও তো স্বাধীনতার শত্রুরাই আজও ক্ষমতাবান। তাহলে আওয়ামী লীগের জন্যও কি যুদ্ধকালের ব্যাপ্তি মাত্র নয় মাসই ছিল। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম।

আওয়ামী লীগ কর্মীর সন্তান হিসেবে প্রায় যুদ্ধাবস্থার মধ্যেই বড় হয়েছি আমরা। আমার আব্বা যখন পাকিস্তানি শাসকের কোপানলের আচ গায়ে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমার মা সংসারের চাকাকে সচল রাখতে জীবনপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। '৬৬ সাল থেকে '৭১ সাল আমার যতটা মনে আছে। আমরা প্রায় যুদ্ধের মধ্যেই ছিলাম। সে যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি স্বাধীনতার পরেও। '৭১ থেকে '৭৫ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই আবারও ঝড়। উড়ে গেল সুখ। হারিয়ে গেল শান্তি শুরু হলো আরও এক যুদ্ধ। এবার আর বিদেশী শাসক নয়। এবারের যুদ্ধ ঘরের লোকের সঙ্গে। এ যুদ্ধে বিপক্ষের দল অস্ত্রহীন। তারা শুধুই অত্যাচারিত হবে এই যেন নিয়তি। আমার আব্বার মতো আওয়ামী লীগ কর্মীরা হলো যুগের বলি। যাদের রক্ত আর ঘামে তৈরি হলো নতুন দেশের ভিত, প্রতিষ্ঠিত হলো আওয়ামী লীগ নামের দল। কিন্তু ওরা সবাই রয়ে গেল অন্তরালে। ওদের ভুলে গেল সবাই। এদের ডেকে পদক দেয় নি সেকাল। সংবর্ধনা জানায় নি একাল। তকে কি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল আমার আব্বার

মতো লক্ষ লক্ষ নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক কর্মীর দল? যারা '৭১-এর নয় মাস নয়। যুদ্ধরত ছিল দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে। যে যুদ্ধে তাদের সাথে প্রতিমুহূর্ত সঙ্গী হয়েছিল তাদের পরিবারের সব সদস্য। আমার মনে হয় তা নয়। আগামীকালের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন সেখানে থাকবে এদের কথা-সেই সব রাজনৈতিক কর্মীদের কথা যাদের যুদ্ধ হঠাৎ শুরু হয়ে নয় মাসে শেষ হয়ে যায়নি। যাদের যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘ পচিশ বছর। তারপরেও সে যুদ্ধকে সম্মানের আসনে আসীন করতে যুদ্ধ করে চলেছে আজও। আগামীকালের ইতিহাস মনে রাখবে না আজকের অনেক সাংসদ, অনেক মন্ত্রীদের। কিন্ত শ্রদ্ধায় সালাম জানাবে সেই যুগবরদের যাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়নি আজও।

মানুষের প্রতি বিশ্বাসের জন্ম

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে আমরা এক গ্রাম থেকে অন্যগ্বামে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। বাবার নিজ গ্রাম নিরাপদ ছিল না। গ্রামবাসীরাও নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের গ্রামে থাকাটা সুনজরে দেখছিল না। একদিন বাবা মাকে বললেন "গ্রামের লোক বলাবলি করছে, আমরা এখানে থাকলে নাকি পাকবাহিনী গ্রামটা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবে।" ’৭১ সালে আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতু ছিলেন সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ সংগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব তথা সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। দীর্ঘদিন রাজবন্দি থাকার পর বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তিনি '৭১-এর পহেলা জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাক হানাদার ও তাদের দোসররা তাঁকে ধরার চেষ্টা করবে। তার ওপর আমাদের সাথে ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদরের তৎকালীন সংসদ সদস্য সৈয়দ হায়দার আলীর আধা বাংলা আধা উর্দুভাষী পরিবার। যুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভেই হায়দার কাকা তার স্ত্রী, চার ছেলে-মেয়ে, ভাই-ভাবী ও দিয়ে ভারতে চলে যান-আর আসতে পারেন নি। হায়দার কাকার সেই অতি আধুনিক পরিবারটি ছিল গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাই সবখানেই তাদের মানিয়ে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। নারী-শিশুসহ ভারতে যাবেন, ঠিক করতে পারছিলেন না বাবা।

আমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে। পাচ-সাত দিন পরপরই জায়গা বদল করতে হচ্ছিল। নতুন নতুন গ্রামে যেতেই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছিল কখনো একটি পরিবার, কখনো যুদ্ধে যেতে আগ্রহী যুবক। নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষায় তিনটি গরুর গাড়িতে মেয়ে এবং শিশুদের তুলে নিয়ে বাবা বগুড়া জেলার পীরহাটি গ্রামে ছোট

ফুফুর বাড়িতে গেলেন। এই গ্রামকে বাবা আগেও বহুবার তার লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পীরহাটি গ্রামের লোকজন ও আমার ছোট ফুফুর পরিবার আশ্রয়দাতা হিসেবে খুবই সহৃদয় ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল। সেখানে আমাদের সাথে যোগ দিল ই পি আর-এর প্রাক্তন সৈনিক ধনু মিয়া। ধনুকাকার বাড়ি ছিল নোয়াখালী। কয়েকদিন পর এলেন বাবার বন্ধু সাত্তার কাকা। তিনিও সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। সাত্তার কাকা বিয়ে করেছিলেন আসামের মাইনকার চরে। সাত্তার কাকা-কাকীমা তো যাবেনই, সে সাথে খবর নিয়ে এলেন আমার সদ্যবিবাহিত চাচাতো বোন মায়া আপা ও আমির দুলাভাইও আমাদের সাথে ভারতে যেতে পারেন। পরবর্তীঁকালে আমির দুলাভাই (আমির হোসেন বুলু) সিরাজগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। স্বাধীনতাযুদ্ধে তার মহান অবদানের কথা সিরাজগঞ্জবাসী চিরদিন সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ রাখবে।

চান্দাইকোনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত পীরহাটি গ্রাম থেকে আমরা ভীত সন্ত্স্থ হয়ে দেখছি বগুড়া-নগরবাড়ি রাস্তার দু'পাশে অবস্থিত গ্রাম ও হাটে-বাজারে পাক হানাদাদের তান্ডবলীলা। চারদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা, কালো ধোয়ায় আচ্ছন্ন আকাশ; শুনছি মর্টার আর মেশিনগান ও রাইফেলের গুলির শব্দ। বাবার কাছে শুনে শুনে মর্টার মেশিনগান ও রাইফেলের গুলির শব্দের পার্থক্য জেনে গেলাম। দেখলাম শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশুন্য হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছোটাছুটি করছে।

সাত্তার কাকার সাথে পরামর্শ করে বাবা নদীপথে ভারতের আসামে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে যাবার বাড়তি সুবিধা ছিল, রৌমারীর ওপারে শ্বশুরবাড়ি। বাবা আমির দুলাভাইকে খরচ দেবার জন্য সাত্তার কাকাকে কাজিপুরের বাংলাবাজারে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক হলো বাবা আমাদের নিয়ে মেছড়ার খাড়ুয়া গ্রামে তার ফুফুর বাড়িতে যাবেন সেখান থেকে সবাই মিলে নদীপথে আসামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হবে। হঠাৎ জানা গেল বাবাকে সহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে হাটে হাঠে ঢোল দেয়া হচ্ছে। কথাটা গুজন না সত্য তা যাচাই করার জন্য অপেক্ষা না করে বাবা তাড়াতাড়ি আমাদের নিয়ে খাড়ুয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়লেন। বার ঘন্টার পথ অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছলাম খাড়ুয়া গ্রামে। সেখানে দুদিন থেকে চারদিকের খোঁজখবর নিলেন বাবা। আমির দুলাভাই, মায়া আপা, সাত্তার কাকা ও কাকীমাও এসে গেলেন। ঠিক হলো প্রথমে যাওয়া হবে কাজিপুরের কান্তনগরে। সেখানে যাবার জন্য দুটি জেলে নৌকা ঠিক করা হলো। নৌকার ভাড়া দুইশো টাকা। রোদে পোড়া মাঝিরা আমাদের হাত ধরে সতর্ক করে দিল,'বেশি নড়াচড়া করবেন না গো খোকা খুকিরা ছোট নৌকা-সকলেরই একটু সাবধানে বসা লাগবো।'

আব্বার ফুফুর বাড়ির আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই নদীর তীরে এসে অশ্রুসজল চোখে আমাদের বিদায় দিলেন। মাঝি চারজন পরম আত্মীয়ের মতো আমাদের নিয়ে নৌকা কান্তনগর চোরের দিকে ভাসিয়ে দিলো। নদীর ঘাট থেকে কান্তনগর মাইলখানেক হাটাপথ। সেখানে হাফিজ মাস্টার সাহেব নামে আমির দুলাভাইয়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তাদের অজান্তেই। মাঝিরা আমাদের মালপত্র সেই বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এলো। বাবা টাকা দিয়ে মাঝিদের বিদায় দিলেন। সাত্তার কাকা, ধনু কাকা সবাই একটা মাদুর পেতে গোল হয়ে বসেছেন অষ্টম শ্রেণীর একটি ভূগোলের পাঠ্যবই নিয়ে। বইয়ের মানচিত্র দেখে তারা যাত্রাপথ ঠিক করতে ব্যস্ত। এমন সময় নৌকার দুজন মাঝি আবার ফিরে এসে দাঁড়াল। বাবা ওদের দেখে উত্কণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে ফিরে এলে যে? কোনো খারাপ খবর আছে নাকি?"

বয়স্ক মাঝি বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল, "না না খারাপ খবর কিছুই নেই।" এই বলে বিনয়ের সাথে একশ টাকা বাবার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একশ টাকা আগাম দিছিলেন, সেইটা বাদ না দিয়া ভুল কইরা দুইশ টাকাই দিয়া দিছেন।" বাবা টাকাটা হাতে না নিয়ে অবাক বিস্ময়ে মাঝির কান্ত ক্লিষ্ট মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "ওটা আর ফেরৎ দিতে হবে না।" কিন্তু সে জোর করে বাবার হাতে একশ টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, "আপনারা দ্যাশ স্বাধীন করার লাইগা বিদ্যাশ যাইতেছেন। সেহেনে ক্যামন থাকবেন তা তো কওয়া যায় না। তাছাড়া রাস্তাঘাটে কত বিপদ আপদ আছে। দ্যাশ স্বাধীন অইলে ফিরা আইসা আমাগো বখশিশ দিবেন-তখন খুশি মনে লইমু।" পরনে লুঙ্গি, খালি গা ছেঁড়া গামছা কাঁধে দরিদ্র মাঝিদের কথা শুনে সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। সবার মনে জাগল নতুন আশার আলো। নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আসবে। এইসব মানুষের দেশপ্রেম, সততা ও বিশ্বাস কখনও বৃথা যেতে পারে না। সেই দরিদ্র মাঝিদের নাম আমার মনে নেই। আর কোনোদিন ওদের সাথে দেখাও হয় নি। ওরা কেউ এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনের মণিকোঠায় ওদের স্মৃতি চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেদিন সেই হতদরিদ্র যে ভিত গড়ে দিয়েছিল, তা আজও অটুট রয়েছে। সেই থেকে মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখেছিলাম। আজও করি। হয়তো কখনো কখনো ঠকেছি। তাতে কি? যত না ঠকেছি, জিতেছি তার চেয়ে অনেক বেশি।

গুলিহীন বন্দুক হাতে ডাকাত দলের মুখোমুখি আমির দুলাভাই

'৭১-এর পঁচিশ মার্চের কালরাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনী বাংলার নিরস্ত্র মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর একমাসকাল সিরাজগঞ্জ মুক্ত ছিল। পঁচিশে এপ্রিল দিবাগত রাতে পাক হানাদার বাহিনী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অতি দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে সিরাজগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে আমাদের নিয়ে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কত যে গ্রাম ঘুরলেন বাবা । যেখানেই আশ্রয় নিতাম সেখানেই দিন কয়েক যেতে না যেতেই গ্রামবাসী এমনকি আশ্রয়দাতা আত্মীয়-স্বজনরাও নিজেদেরকে ভীষণভাবে বিপদগ্রস্ত ভাবত। অবশেষে মেছড়ার খাড়ূয়া গ্রাম থেকে বিশজনের এক বিরাট বহর নিয়ে আমরা কাজিপুরের কান্তনগর গিয়ে পৌঁছলাম । সেখানে আমির দুলাভাইয়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে একরাত কাটালাম। পরদিন সকালেই একটি মাঝারি আকারের নৌকা ঠিক করে। বাবা আমাদের নিয়ে যমুনা নদীর বুকে ভেসে চললেন এক অজানা দুর্গম পথের উদ্দেশ্যে । লক্ষ্যস্থল ভারতের আসাম প্রদেশ। নৌকার মাঝিমাল্লা

চারজন বাদে আমাদের বহরে বিশ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন ছিল সমর্থ পুরুষ । বাকি সবাই নারী ও শিশু । আজও ভাবতে অবাক লাগে যে এত মানুষের এটুকু নৌকায় জায়গা হলো কি করে?

হাত-পা ছড়িয়ে বসার জায়গা কারো হতো না। পুরুষ সদস্যরা অধিকাংশ সময়

ছইয়ের বাইরেই থাকতেন । তবু আমাদের হাত-পা গুটিয়ে পালা করে ঘুমুতে হতো । নৌকাতে আমরা বোধ হয় সাত দিন সাত রাত ছিলাম । রাতের বেলা কোনো চরে নৌকা ভিড়িয়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারা হতো । নৌকাতেই রান্না-খাওয়া। বেশির ভাগ দিনই ভাত রান্না করে পানি দিয়ে রাখা হতো । পরে সবাই সেই পান্তাভাত শুধু লবণ মরিচ দিয়ে খেতাম ।

চারদিন মেয়ে শিশুরা গোসল করেনি । তাই একটা চরে নিরাপদ জায়গা দেখে নৌকা বাধা হলো । চরের অনেক দূরে বিচ্ছিন্নভাবে দু-চারটা ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমরা ছোটরা সবাই বাবা ও সাত্তার কাকার তত্ত্বাবধানে নদীতে লাফঝাপ দিয়ে মহানন্দে গোসল করছি। বেশ কিছুটা দূরে হাটু পানিতে দাড়িয়ে আমার মা, মায়া আপা, সাত্তার কাকার স্ত্রী, হায়দার কাকার স্ত্রী ও বড় চাচী মগ, ঘটি, বদনা ইত্যাদি দিয়ে পানি তুলে মাথায় ঢেলে গোসল সারছেন। ওনারা কেউই সাতার জানেন না। তাই নদীতে নেমে গোসল করাটা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন সময় দেখা গেল আমির দুলাভাই একটা বালতি হাতে চর ভেঙে দ্রুত হেটে আসছেন । আমরা যখন গোসলে ব্যস্ত সেই সময় আমাদের অগোচরে তিনি চরের মধ্যে বসাবসাকারী লোকদের বাড়িতে গেছেন। কিছু খাবার জোগাড়ের আশায় । কিছু না পেয়ে আমাদের জন্য এক বালতি দুধ কিনে এনেছেন। আমরা তো মহা খুশি, অনেকদিন বাদে দুধভাত খেতে পাব ভেবে ।

নৌকা আবার চলছে। মাঝিরা জানাল, আমরা বাহাদুরাবাদ ঘাটের কাছে চলে এসেছি। এখানে যমুনা নদী অনেক প্রশস্ত। পূর্বদিকে বাহাদুরাবাদ, পশ্চিমে ফুলছড়ি ঘাট । জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক । এখানে পাকিস্তানি আর্মিরা গানবোট ও স্পিডবোট নিয়ে অনবরত টহল দেয়। মাঝিরা বাবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করে নিল যে কীভাবে এই বিপদসন্কুল এলাকাটা অতিক্রম করা হবে। ঠিক হলো আমরা সবাই

নৌকার মধ্যে চুপ করে শুয়ে থাকব । যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায় যে নৌকাতে কোনো মানুষ আছে। ছইয়ের মুখটা খড়ি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়া হলো যাতে দেখলে মনে হবে এটা একটা খড়ির নৌকা। ছাইয়ের বাইরে মাঝিদের সঙ্গে আমির দুলাভাই মাথায় গামছা বেধে নৌকার পেছনে হাল ধরে বসলেন । আল্লাহর রহমতে তখন আমাদের যাত্রাপথের অনুকূলে প্রচুর বাতাস বইতে শুরু হলো । মাঝিরা নৌকায় একসাথে দুটো পাল তুলে দিলো । প্রচণ্ড হাওয়ায় শ্যালো নৌকার থেকেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল আমাদের পালের নৌকা। আমরা সবাই প্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃশব্দে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছি ছইয়ের ভেতরে । মা-চাচীদের হাতে তসবিহ্, মনে মনে সবাই দোয়া দরুদ পড়ছেন। আমরা ছোটরাও দোয়া ইউনুস পড়ছি। আমরা যখন পীরহাটিতে ছোট ফুফুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন মা আমাদের ইউনুস নবীর মাছের পেট থেকে বেঁচে ফেরার ঘটনাটা বলে দোয়া ইউনুস শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি

বলেছিলেন, যদি আমরা একলক্ষ বার এ দোয়াটা পড়ে ফেলতে পারি তাহলে কোনো বিপদই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

হঠাৎ স্পিডবোটের শব্দ শুনতে পেলাম । ছইয়ের ফুটো দিয়ে একটা স্পীডবোট যেতে দেখলাম । স্পিডবোটে তিন-চারজন সশস্ত্র পাকসেনা । ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরলাম । বাবা নিচু এবং গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিলেন, ওরা যদি নৌকা থামানোর কথা বলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সবাই গুলি শুরু করবে।

তৎক্ষণাৎ বাবা ও সাত্তার কাকা নৌকার সামনে রাখা খড়ির স্তূপের আড়ালে অস্ত্রহাতে পজিশন নিলেন। নৌকার পিছনে আমির দুলাভাই, ধনু কাকা, জাফর কাকা- সবাই পাটাতনের নিচে শুয়ে পড়ে যার কাছে যে অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে প্রস্তুত রইলেন। কিন্তু স্পিডবোটের পাক সৈন্যরা আমাদের নৌকাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে ফুলছড়ি ঘাটের দিকে চলে গেল। মিনিট দশেক পর মাঝিরা বলল, মায়েরা, এখন আপনারা আরাম কইরা বসতে পারেন । বাহাদুরাবাদ ঘাট থেইকা আমরা অনেক দূরে চইলা আইছি।

সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল। নৌকার মুখ থেকে খড়ির স্তূপ সরিয়ে সেগুলো পাটাতনের নিচে রাখা হলো। বাতাসের গতিবেগ বাড়ল। নৌকা আরও দ্রুতগতিতে ছুটে চলল। বাবা ও সাত্তার কাকা ছইয়ের বাইরে গিয়ে নৌকার সামনের দিকে মুক্ত হাওয়ায় আরামে বসলেন। অস্ত্রগুলো পাশেই পাটাতনের ওপর রাখলেন।

আমির দুলাভাইরাও একইভাবে নৌকার পেছনে বসলেন। পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই নৌকার সামনে বসে থাকা বুড়ো মাঝিটা ভয়ার্ত কণ্ঠে একটা খোলা নৌকা আমদের নৌকার কাছাকাছি এলো । সেই নৌকায় দশ-বার জন লোক । সবার হাতেই রামদা, ছুরি, ফালা ইত্যাদি । সামনে দাঁড়ানো লোকটার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র পরে বাবার কাছে শুনলাম ওটা ছিল দেশি পাইপগান।

নিমিষের মধ্যে বাবা রিভলবার হাতে দাড়িয়ে গর্জন করে বললেন, খুলি উড়িয়ে দেব।' গেছেন। আমাদের নৌকার পেছনের দিকে বন্দুক, রাইফেল ও পিস্তল হাতে দাড়িয়েছেন আমির দুলাভাই, ধনু কাকা ও জাফর কাকা। ডাকাতদের দিকে চকচকে বিদেশি দোনলা বন্দুক তাক করে আমির দুলাভাই ভীষণ তর্জন করছেন। শরণার্থীদের নৌকা ভেবে ডাকাতদল হামলা করতে এসেছিল। কিন্তু একসাথে এতগুলো চকচকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে হতভম্ভ ডাকাতদল যার হাতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে হাতজোড় করে নৌকার মধ্যে বসে পড়ল । তারপর নিজেদের নৌকা নিয়ে দ্রুত ভাটির দিকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে লাগল ।

আমির দুলাভাইয়ের তর্জনগর্জন তখনও থামেনি । তিনি ডাকাতদের উদ্দেশ্যে বন্দুক তাক করে চিৎকার করে বলছেন, “সব শালাকে গুলি করে মারব।” আমার মা-বাবা

গুলি ছুড়তে নিষেধ করে বলছেন, “কেউ গুলি করবে না। গুলির শব্দ বাহাদুরাবাদ ঘাটে পৌঁছে যাবে । তখন সেখান থেকে পাকসেনারা গানবোট নিয়ে তাড়া করলে সহজেই আমাদের ধরে ফেলবে ।

মায়ের কথায় সবাই শান্ত হলো । ডাকাতদলের নৌকা অনেক দূরে চলে গেল । হঠাৎ আমার চোখ পড়ল আমির দুলাভাইয়ের বন্দুকের গুলির বেল্টটা গুলিসুদ্ধ পাটাতনের নিচে পড়ে আছে। নৌকাতে নারী-শিশু ভর্তি, তাই বাবা নিরাপত্তার খাতিরে বন্দুকে গুলি লোড করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন । অন্য অস্ত্রগুলোতে গুলি ভরে সাবধানে রেখে দেয়া হতো । আমি তারপর চিৎকার করে বললাম দুলাভাই আপনার বন্দুকে তো গুলি নেই।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে শত দুঃখ আর শঙ্কার মাঝেও নৌকার মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

আমির দুলাভাই কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে আমাকে ধমকে বললেন, আরে গাধা, যুদ্ধ শুধু অস্ত্র দিয়ে হয় না। যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সাহস আর মনোবল ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস আমির দুলাভাইয়ের সেই কথাটি অমোঘ সত্যে পরিণত হতে দেখেছি। কেবল মাত্র দুর্জয় সাহস আর অসীম মনোবলের জন্যেই বীর বাঙালিরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ পাক হানাদারদের পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল। অবসরে কোনো মুহুর্তে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়লে আজও আপন মনে হেসে উঠি, প্রতিরোধের কথা স্মরণ করে।

দুজনের চোখেই পানি

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস আসে। '৭১-এর স্মৃতি জাগানিয়া দিনের কথাগুলো এইদিনে বেশি বেশি মনে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসের

অজস্র স্মৃতি আজও আমাকে কাঁদায়। '৭১ সালে আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। পারিবারিকভাবে একটা রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলাম বলে অনেক কিছুই হয়তো একটু বেশি বুঝতাম। বিশেষ করে দেশ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল। উনসত্তরের

গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল পুরো দেশের সঙ্গে আমার ছোট্ট মনকেও। আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতু ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা (তখন মহকুমা) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতার পরেও প্রায় দুই দশক সময় তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। যেহেতু বাবা রাজনীতি করতেন। সেহেতু আমাদের পরিবারের ওপর মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই অনেক বিপদ নেমে আসে। বাবা একবছর জেল খেটে '৭১-এর পহেলা জানুয়ারি বেরিয়ে এলেন। জেল থেকে বের হয়েই আবার রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সারাদিনে আমরা বাবার দেখা পেতাম খুব কম সময়ই। এরপর শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বাবা ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাকে তখন প্রায়ই বলতে শুনতাম "উপযুক্ত ট্রেনিং আর আধুনিক অস্ত্র ছাড়া এই অসম যুদ্ধে কখনও জয়লাভ করা যাবে না।"

সিরাজগঞ্জ, বগুড়ার গ্রাম থেকে গ্রামে পলায়নরত অবস্থায় চলতে থাকে আমাদের জীবন। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন সেই সময়ের সিরাজগঞ্জের একজন প্রভাবশালী

সংসদ সদস্যের পুরো পরিবার। তিনি তার স্ত্রী, চার ছেলেমেয়ে, বড় ভাই ভাবি সবাইকে আমাদের ভরসায় ফেলে রেখে যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলে যান।'৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর তিনি অবশ্য রং বদলেছেন বারবার। এই এমপি সাহেবের স্ত্রী ও ভাবী ছিলেন উর্দুভাষী মুসলমান। তবে আধো আধো বাংলা বলতে পারতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে আমাদের মতো গ্রাম-গঞ্জের মানুষদের সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না। না ভাষা, না চেহারা-কোনোভাবেই তারা আমাদের মতো ছিল না। তাদের নিয়ে বাবার তখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো অবস্থা। আমার বাবা দু-পরিবারের পনেরো জন লোকের এক বৃহৎ বহর নিয়ে

তাড়াখাওয়া কুকুরের মতো ঘুরতে লাগলেন গ্রাম থেকে গ্রামে। আমরা যেসব পড়তেন। বাবার সামনে তখন একটাই লক্ষ্য ছিল-যে কোনোভাবেই হোক ভারতে চলে যাওয়া এবং যুদ্ধে যোগ দেয়া। কিন্তু বাবার সামনে পাহাড় সমান বাধা হয়েছিলাম আমরা এবং তার সাংসদ বন্ধুর পরিবারবর্গ।

বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন এই বিশাল বহর নিয়ে যাবেন। নাকি একা যাবেন। তার পক্ষে একা যাওয়া ছিল খুবই সহজ। কিন্তু একটা প্রশ্ন দেখা

দিলো । এই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হবে? আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ কি এক প্রজন্মে শেষ হবে? যদি ভিয়েতনামের মতো দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয়। তবে পরিবারের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ মেনে নিয়ে যেতে হবে। যা মেনে নেয়া মা-বাবা দুজনের জন্যই ছিল প্রচণ্ড কষ্টকর। '৭১-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে কেউই ভাবতে পারেনি, যুদ্ধ মাত্র ন'মাসে শেষ হবে। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, কপালে যাই থাকুক না কেন, সবাই এক সঙ্গে যাওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হলো তখন আমরা বগুড়ার পীরহাটি গ্রামে আর আমাদের ন'মাসের ছোটবোন আমাদের নিজ গ্রাম মুগবেলাই , মেজমামীর কাছে।

অবশেষে আমরা কাজিপুর কান্তনগর থেকে নদীপথে রওনা দিলাম ভারতের আসাম প্রদেশের উদ্দেশ্যে। বাবা পথ চেনার জন্যে তাকিয়ে আছেন অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল বইয়ের মানচিত্রের দিকে। রওনা দেয়ার আগে আমাদের সাথে এসে যোগ দিয়েছেন বাবার বন্ধু সাত্তার কাকা ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। আমার সদ্যবিবাহিত চাচাতো বোন মায়া আপা ও তার স্বামী আমির দুলাভাই। আরো যোগ দিয়েছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর একজন সদস্য ধনু কাকা । দলের সব পুরুষ সদস্যের কাছেই ছিল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র । মহিলাদের হাতে তজবি। আমাদেরকে সর্বক্ষণ আল্লাহকে ডাকতে বলা হলো। প্রায় টানা সাতদিন নৌকা চলল। আমরা সারাক্ষণ নৌকার ভেতরেই থাকতাম। নৌকার ছৈয়ের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল লাকড়ির বোঝা দিয়ে। কেবলমাত্র নাওয়া-খাওয়ার জন্য বিভিন্ন চরে নৌকা থামানো হতো। মাঝেমধ্যে রাতেও কিছু সময়ের জন্য চরে নৌকা ভিড়াতে হতো। এভাবে চলতে চলতে কোনো একদিন সন্ধ্যায় চিলমারির পূর্বদিকের এক চরে এসে নৌকা

ভিড়ল। এখানে অনেক নৌকা বাধা। চরের মধ্য দিয়ে শত শত মানুষকে কাঁধে কেরোসিন তেলের টিন ও লবণের বস্তা দিয়ে পূর্বদিক থেকে সারে সারে আসতে দেখা গেল। নৌকা থেকে নেমে বাবা লোকজনদের সাথে কথা বলে জানতে পারলেন, এখান থেকে বিশ মাইল দূরেই ভারতসীমান্ত। সীমান্তের সবচে' কাছে যে বাজার সেখান থেকেই এ সব জিনিসগুলো আসছে।

বাবা সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিলেন হেটে রওনা দেবেন ভারতসীমান্তের দিকে। দলের অন্য সদস্যরা তখন বলল, গ্রামের লোকজন যখন বলছে বিশ মাইল, তখন এই দূরত্ব পচিশ বা ত্রিশ মাইলও হতে পারে। মহিলা ও শিশুরা কী এতটা পথ হাটতে পারবে? কিন্তু বাবা দৃঢ়ভাবে বললেন, "পারতেই হবে। আমরা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই রওনা দেব। তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও। নৌকা থেকে নেমে গেলেন। যাবার আগে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে গেলেন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হালকা জিনিস ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নেয়া যাবে না। কারণ দীর্ঘ পথ হাটতে হবে। ভারি কিছুই বহন করা সম্ভব হবে না।

মা টাকা আর গহনাপত্র নিয়ে নিলেন সঙ্গে। আর টুকিটাকি কাপড়চোপড় ভরে নিলেন ছোট্ট দুটি ব্যাগে। যার একটা রইল মায়ের হাতে

অন্যটা রোকেয়া বুবুর হাতে। রোকেয়াবুকে মা ছোটবেলা থেকে পালতেন। আর সব পরিবারের সদস্যরাও মায়ের মতো তৈরি হলেন। দলের পুরুষ সদস্যরা সবাই কাধে তুলে নিলেন রাইফেল-বন্দুক, কোমরে গুঁজে নিলেন পিস্তল-রিভলবার।

রাত আটটার দিকে আমরা হাটতে শুরু করলাম। সারারাত আমরা হাটলাম অবিশ্রান্তভাবে। বাবার কথা ছিল "পেছনে ফিরে তাকাব না।কারও জন্য অপেক্ষাও করব না। যে কোনোভাবেই হোক সামনে এগুতে হবে।" পথে যেতে যেতে মা ও রোকেয়াবু'র হাত থেকে কখন ব্যাগ ফেলে দিয়েছে কেউ জানে না। পা থেকে প্রায় সবাই জুতা খুলে ফেলে দিয়েছে। ভোরের আলোয় দেখা গের সবার পা খালি । দলের কারো হাতে ব্যাগ-পুটলি কিছু নেই। পথে ফেলে এসেছে সবকিছু । ভোরের আলোয় আমাদের সবার মনে জেগে উঠল আশার আলো । দেখা গেল ভারতীয় সীমান্তের পাহাড় । আর কিছুটা পথ অতিক্রম করলেই নিরাপদ জীবন। তাই সবাই প্রায় দৌড়াতে শুরু করলাম পাহাড় লক্ষ্য করে । পথের পাশে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। বাবা দাঁড়িয়ে আবেগময় এক বক্তৃতা দিলেন জনতার উদ্দেশ্যে। সীমান্তে পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটি খাল। পার হয়ে গেলেই ভারত । বাবার বক্তৃতা শেষে একজন বৃদ্ধা বাবার মাথায় হাত রেখে বললেন "তোমার কথা শুইনা খুব ভালো লাগলো, দোয়া করি তোমরা জয় কইরা ফিরা আইস।" তিনি কিছু মুড়ি ও গুড় খেয়ে যেতে বললেন। বাবা বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, "না মা, আজ না। যদি কখনো ফিরি তখন খাব!" বৃদ্ধা ও বাবা দুজনের চোখই অশ্রুসজল। অন্যদের চোখও শুকনো ছিল না।

আমরা মেঘালয় দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। ছোট ডিঙ্গায় এককেবারে তিন-চার জন করে নদী পার হতে হচ্ছে।

সবশেষে রইলাম বাবা, মা আর আমি । বাবা সজল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হয়তো আর কোনোদিন দেশে ফেরা হবে না। এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে কে জানে । ছেলেমেয়েরা যদি কোনোদিন ফিরতেও পারে তবে সেই দেশ আর আজকের দেশ কি এক হবে? আমার বাবা হাত দিয়ে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে রুমালে বেঁধে নিলেন। তারপর মা ও আমাকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। সামনে নতুন দেশ। পেছনে ফেলে গেলেন স্বজন আর প্রিয়তম দেশ । আমার মা-বাবার দু'চোখে কান্নার প্লাবন। কার জন্যে সেদিন এত কেঁদেছিলেন ওরা? ওদের স্বজন? না কি প্রিয়তম দেশ? কাকে ছেড়ে যেতে বুকফাটা কান্নায় আকুল হয়েছিল ওরা? তবে সেই কান্নার রেশ আজও রয়ে গেছে আমার মনের কোণে । স্বাধীন সার্বভৌম প্রিয়তম দেশকে অসহায় দেখে আজও যা বাধ মানতে চায় না।

’৭১-এ ফারাক্কা ঘাটের সেই কুলি

মাইনকার চর থেকে রওনা হয়েছি কলকাতার পথে । আমাদের বিশাল বহর। এই বহরে আবার বাচ্চার সংখ্যাই বেশি। আমরা চার ভাইবোন। হায়দার কাকার চার ছেলেমেয়ে, মোট আটজন। একজন কাজের মেয়ে রোকেয়াবু আর হায়দার কাকার কাজের ছেলে আখতার। ওরাও আমাদের মতো ছোট। সতেরো জনের বিশাল বহর নিয়ে মাইনকার চর থেকে কলকাতার বিশাল দূরত্ব। পাহাড় নদী জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। এক সময় নাকি আসামের এই অঞ্চলের মানুষ পূর্ব বাংলার মধ্য দিয়ে কলকাতা যেত। উনিশশো সাতচল্লিশ এর পরে বন্ধ হয়ে গেছে সে পথ। মাইনকার চর থেকে কলকতায় ফোন করে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে কথা বলে আব্বা সবাইকে নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হলেন। কি যে ভয়ঙ্কর সে যাত্রা আজ আর তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। আমার আব্বারও তো অচেনা-অজানা পথ।

মাইনকার চরে থেকে গেলেন সাত্তার কাকা ও তাঁর স্ত্রী। ওখান থেকেই যুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেলেন ধনু কাকা। আমরা চললাম কলকাতার দিকে। প্রথমে ধুবরী নামের একটা শহরে গিয়ে পৌঁছলাম। ধুবরী আসামের একটা জেলা শহর। ধুবরীর সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিলাম আমাদের শহর সিরাজগঞ্জের। ধুবরী শহরের পাশ দিয়েও বয়ে চলেছে উত্তাল নদী। হয়তো যমুনাই। আমরা ধুবরীতে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ধুবরী থেকে আমাদের গন্তব্য শিলিগুড়ি শহরে গিয়ে পৌঁছলাম দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রার পর। শিলিগুড়ি শহরে বেশ বড় এভারেডি এরকম কোনো নামের হোটেলে গিয়ে উঠলাম আমরা । আমাদের শরণার্থী অবস্থার সঙ্গে সেই বড় হোটেলটা হয়তো ঠিক খাপ খাওয়ার মত নয়। তবুও আমার আব্বা এ হোটেলটা বেছে নিয়েছিলেন। কারণ আমার যতদূর মনে

পড়ে হোটেলটার মালিকের আদি বাড়ি ছিল সিরাজগঞ্জ।

আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। বড় বড় ঘরে প্রশস্ত বিছানা। ঘরের সাথে লাগোয়া বড় বাথরুম। আর জানালা খুললেই হিমালয় পাহাড়। বরফের চুড়ো। তার উপরে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। ভারী সুন্দর।

এই হোটেলে দুদিন থেকেছিলাম আমরা। এরপর আবার কলকাতার পথে রেলগাড়িতে যাত্রা শুরু। বাংলাদেশের শরণার্থীতে গিজগিজ করছে

আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ। সরকারি পরিবহন রেলগাড়িতে টিকেট কাটতে হয়না। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রচন্ড ভিড়। এমনিতেও তো ওদের লোকসংখ্যা কম ছিল না কোনকালেই। আর তখন, মানে '৭১ সালে তো সর্বত্রই জয়বাংলার লোক বলে পার পাওয়া যেত।

শিলিগুড়ি শহর থেকে ট্রেনে ফারাক্কা বাধের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলত না বোধ হয়। সবটা ঠিক মনে নেই। শুধু খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে রাতে রেল লাইনের ধারে কাকর বালির ওপরে একটা চাদর মতো কিছু বিছিয়ে বসে আছি আমরা সবাই। ঢুলুঢুলু চোখ, যারা একেবারে ছোট ওরা মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। যতদূর চোখ যায় শুধু মাথা দেখা যায়। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। এদের বেশিরভাগই বাংলাদেশি শরণার্থী। আমার আব্বা-আম্মার আলোচনা থেকে জানলাম ট্রেনে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তার মধ্যে আবার আমরা একসাথে এতজন। আমার বাবা কুলি ঠিক করতে গেলেন। যারা আগে থেকে ট্রেনে আমাদের জন্য স্থান দখল করে নিয়ে আসবে।

ট্রেন এসে দাঁড়াল তীব্র হুইসেলের শব্দ করে। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি টানটান উত্তেজনা নিয়ে। ছোট দু'বোন রিতা আর অনিতাকে কোলে তুলে নেয়া হয়েছে। রোকেয়ার ও আম্মার হাতে ছোট ছোট দুটো পুটলি। আমরা ভারতে যখন ঢুকি তখন সবার পরনের কাপড়টুকুই ছিল সম্বল। মাইনকার চরে একসেট কাপড় কিনে তবে গোসল করা হয়েছিল। তাই পোটলা ছোট। আর সে সময় পলিব্যাগ বস্তুটার সাথে দেখা হয়নি, অগত্যা পোটলা।

হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে। এদের কজনের স্থান হবে ট্রেনে? ট্রেনের কামরাগুলোতে তিল ধারনের জায়গা নেই। ছাদে, দরজায়, জানালায় ঝুলছে অসংখ্য মানুষ। এর মধ্যে কোথায় পা রাখব আমরা? আমার মা কাঁদোকাঁদো চেহারা নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। আর আব্বার ঠিক করা সেই ইয়া লম্বা চওড়া তাগড়া জোয়ান কুলিরা সব হওয়ায় মিলিয়ে গেছে। লোকজন একযোগে আছড়ে পড়ল ট্রেনের কামরার ওপরে। সমুদ্রের গর্জনের মতো মানুষের কোলাহল। এরই মধ্যে একটি কামরার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে ডাক দিলো কুলিদের একজন। আর একজন দরজায় দাঁড়ালো আমাদের ট্রেনের কামরায় তুলতে। ভয়াবহ ভিড় ঠেলে আমাদের দলকে নিয়ে

চলল নির্দিষ্ট স্থানের দিকে। ট্রেনের প্যাসেজের মধ্যে দাড়িয়ে আছে লোকজন আবার সেই সাথে হেটে একদিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছে। আমরা কেমন করে হেঁটে পার হচ্ছিলাম ঐ পথ জানি না।

হঠাৎ মনে হলো আমি আর চলছি না। চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে গেছে। আমি আমার দল থেকে আলাদা হয়ে গেছি। চারদিকে থেকে মানুষের চাপে একটুও নড়তে পারছি না। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। মনে হলো মরে যাচ্ছি। মনে হলো আমি মানুষের পায়ের তলায় পড়ে গেছি। আমার মা-বাবার কানে বোধ হয় আমার চিৎকার পৌছানোর পরে তারাও খেয়াল করলেন দলে আমি নেই। বিকট হইচইয়ের মধ্যেও আমার দম ফাটানো চিৎকারে ট্রেনের কামরার মধ্যে আরেক প্রস্থ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আমি ছোট হলেও বয়সের তুলনায় বরাবরই বাড়ন্ত শক্তপোক্ত ছিলাম বলেই বোধ হয় তখনও বেঁচেছিলাম। আর বাঁচার জন্য তারস্বরে চেচিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। হঠাৎ করেই আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম । দেখলাম আমি সব মানুষের মাথার ওপর দিয়ে চলেছি। আমার চিৎকার শুনে কুলিদের একজন ভিড় ঠেলে পেছনে এসে হাজার মানুষে পায়ের তলা থেকে উদ্ধার করে আমাকে। সেই আসুরিক ভিড় ঠেলে আমাকে পৌঁছে দিল আমার মা-বাবার কাছে। আমাদের দলটি ততক্ষণে নিজেদের বসার জায়গা দখল করেছে । অবশ্য গাদাগাদি করে একটা বেঞ্চে।

আজ আর সেই কুলিটির চেহারা ততটা স্পষ্ট মনে নেই। নাম তো তখনও জানতাম না। শুধু অবয়বটুকু মনে পড়ে । আর মনে আছে আমার প্রাণদাতার টুকটুকে লাল জামা । কুলিদের লাল ইউনিফর্ম পরা সেই দীর্ঘকায় মানুষটির কথা মনে হলে আজও আমার মন ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধায়। সেদিনের সেই ঘাটের কুলির হয়তো মনেও নেই যে সে একদিন প্রাণ বাঁচিয়েছিল একটি অসহায় শরণার্থী বালিকার । কিন্তু সেদিনের সেই আমি আজও পরিণত বয়সে এসে প্রায়ই ভাবি অন্তত নামটাও যদি শুনতাম। নিজের মুখে অন্তত একটা ধন্যবাদ দিতাম সেদিন। আমার বা-বাবা অবশ্যই তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন । আমার দেয়া হয়নি। কারণ তখন সেই মুহুর্তে আমার সে অবস্থা বা বুদ্ধি কোনটাই ছিল না। কিন্তু তাই বলে ভুলে যাইনি। সেদিনের কথা বা সেই মানুষটিকে । আজ '৭১-এর কথা লিখতে গিয়ে তাকে মনে পড়ছে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায়।

আমরা শরণার্থী হলাম

মাঝখানে ছোট্ট একটা খাল। এপারে বাংলাদেশ-ওপারে ভারত। একটাছোট্ট নৌকা। পচিশ তো দুরের কথা, পাচজনও একসাথে পার হওয়া কষ্ট।এত ছোট নৌকা। সারারাত হেঁটে আমরা সীমান্তে পৌঁছেছি। রাতে আমারবাবা বারবার থেমেছেন। বিভিন্ন বাজারে-হাটে বক্তৃতা করেছেন।জনসাধারণকে যুদ্ধে যোগ দিতে বলেছেন। যে কারণে বেশ দেরি হয়েছেএ দেখ দূরে পাহাড়। ওখানেই যাব আমরা। ওখানে পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই।

শান্ত গম্ভীর সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে দ্রুত হেঁটেছে আমাদের দোল। আমার বাবা আমাদের বলেছেন এই তো আর একটু। তারপরেই ভারত।

এপারে চিলমারীর একটা গ্রাম-ওপারে ভারতে মেঘালয়ের কালাইয়েরচর। আমরা এই জায়গা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম। নদী পার হয়েই এলিয়ে পড়লেন সৈয়দ হায়দার আলীর বড় ভাবী। মানে জ্ঞান হারালেন কিছুক্ষণের জন্য। পথশ্রমের ক্লান্তি ও টেনশনে স্নায়ু তো টানটান হয়েছিল। বিশ্রাম পেতেই বেচারার এই অবস্থা।

নদীর পাড় থেকে একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে দুপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। আমাদের দল পাহাড়ের গোড়ায় আসতেই কোথা থেকেযেন একদল উর্দিপরা সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্য এসে ঘিরে ধরল আমাদের। উদ্যত অস্ত্র আমাদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে বলল অস্ত্র নামিয়ে রেখে হাত উপরে উঠাতে। আব্বাও তার দলকে হুকুম দিলেন অস্ত্র নামিয়ে রাখতে। আমাদের কাছে ছয়-সাতটি অস্ত্র ছিল।

পাহাড়ের নিচে বিশাল মাঠ। হাজার হাজার বাংলাদেশি শরণার্থী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। বড় একটা বট গাছের নিচে বসলাম আমরাও। আব্বাকে নিয়ে গেলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। সব অস্ত্র জমা দিয়ে একটি রশিদ দিয়ে দিলো। নাম-ঠিকানা ইত্যাদি

জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তারপরে বলে দিলো অপেক্ষা করতে।

আব্বা এসে আম্মাকে জানালেন আমাদের শরণার্থী শিবিরে পাঠানো হবে। তবে কখন কীভাবে তা বলেনি।

আব্বা আমীর দুলাভাইকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের কোণে দোকানে গেলেন আমাদের জন্য খাবার কিনে আনার জন্য। দুলাভাই ফেরত এলেন এক কাঁদি পাকা কলা নিয়ে। আমরা সবাই মিলে মুহূর্তে সব কলা খেয়ে শেষ করে দিলাম। এদিকে আমরা বসে আছি তো আছিই। ঘন্টা পার হয়ে গেলো। আব্বা আর আসেন না। আম্মা অস্থির হয়ে ওঠ-বস করতে লাগলেন। আমীর দুলাভাই বললেন, চল তো দেখি কাকা কই গেলেন।আমরা আব্বাকে খুঁজতে দোকানটায় গেলাম গিয়ে দেখি আব্বা তারটাকা ও কাগজপত্রের ব্যাগটা টেবিলে রেখে, তার ওপর মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। দুলাভাই আব্বাকে ডেকে ওঠালেন। বললেন, আরে কাকা আপনি এখানেএভাবে ঘুমাচ্ছেন! ব্যাগটা যদি কেউ নিয়ে যেত?

দুজন পুলিশের লোক এসে আমাদের গাছতলা থেকে থানায় নিয়ে গেলো। থানাটা একটা টিলার ওপরে। থানার একটা ঘরে আমাদের বসতে দিয়ে বলল অপেক্ষা করতে। এখান থেকেই শিবিরে পাঠানো হবে। বাস বা ট্রাক। যা হোক একটা যান পাওয়া গেলেই আমাদের যাবার ব্যবস্থা হবে।

আব্বা সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার ওপর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কর্মী। সে কারণেই খোলা মাঠ থেকে উঠিয়ে আমাদের এই ঘরটায় বসতে দেয়া হলো। ঘরটায় দুটো চৌকি পাতা।চাচীরা, মায়া আপা সাবই শুয়ে পড়লো। আম্মা ছটফট করতে থাকলেন।খাওয়ার কি হবে তাই ভেবে। কারণ আব্বাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ।

এমন সময় আমীর দুলাভাই আমাদের বাইরে ডাক দিলেন। বললেন চল রান্না করি। টিপু ভাইয়া, টিটো ভাইয়া, আমি, রোকেয়াবু সবাই দুলাভাইয়ের সহযোগী। দুলাভাই পাথর দিয়ে একটা চুলা বানালেন।আমাদের বললেন শুকনো ডাল-পাতা জোগাড় করে আনতে। কোথা থেকেএকটা বড় হাড়ি আনলেন। আব্বার কথা না শুনে আম্মা ও দুলাভাই কিছুচাল আর আলু এনেছিলেন নৌকো থেকে। চুলা জেলে ভাত চাপালেন। আলুগুলো ধুয়ে ভাতের মধ্যে সিদ্ধ দিয়ে দিলেন। ভাত হলে দুলাভাই আলু চটকে ভর্তা বানালেন। কলাপাতা কেটে সবাইকে ডাকলেন খেতে। ভাতদেখে সবাই হইহই করে উঠলো। চাল কোথায় পেলে? হাঁড়ি কোথায় পেলে? রান্না করলে কি করে ইত্যাদি প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। দুলাভাই হাসি দিয়ে কাজ সারলেন। এ কথা বললেন না যে নৌকা থেকে নামার সময় কিছুটা চাল নিয়ে এসেছেন। কারণ আব্বা যদি বকা দেন। নৌকা থেকে নামার সময় আব্বা কোন কিছু সঙ্গে নিতে বারণ করেছিলেন।

কলাপাতায় অল্প অল্প ভাত আর আলু ভর্তা দেয়া হলো সবাইকে। ভাত আলু ভর্তা দিয়ে মেখে মুখে দিয়েই সবাই থমকে গেলো। কারণ ভর্তায় লবণনেই। দুলাভাই লবণ

জোগাড় করতে পারেন নি। তাই লবণ ছাড়া ভর্তা ওভাত। তবে এ থমকে যাওয়া এক মুহুর্তের জন্যে। তারপরেই আমার গপগপ্ করে খাওয়া শুরু হল। নিমিষেই খাওয়া শেষ। আলুনি সেইখাবারের স্বাদ আজও আমার মুখে লেগে আছে। সারাজীবনে কত কি খেলাম। কিন্তু সেদিনের মতো আর খেয়েছি কি ? মনে পড়ে না।

খেতে বসে দেখি সাত্তার কাকা নেই। আমি বললাম আম্মা সাত্তার কাকা কোথায়? দেখছি না তো!

আম্মা একটা চাপা ধমক দিলেন-চুপ কর।

আমাদের থানায় এনে বসতে দেয়ার পরেই আব্বা সাত্তার কাকাকে মানকার চরে পাঠিয়ে দেন। আমাদের দলটা তো বেশ বড়। একজন যে নেই এটা ওরা খেয়ালই করেনি। সাত্তার কাকা একটি লাকড়ি বোঝাই ট্রাকেচড়ে মানকার চরে চলে গেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে জানাতে যে আব্বা ভারতে এসে পৌঁছেছেন।

বিকেলের দিকে শরণার্থী বোঝাই কয়েকটি বাস, ট্রাক রওনা হলো মূল শিবিরের দিকে। আমাদেরও উঠতে হলো ওদের সাথে। সন্ধ্যে পার করে আমাদের বাস এসে থামলো আমিনবাজার শরণার্থী শিবিরে।

আব্বা শিবিরের অফিসঘরে গিয়ে সবার নামধাম লিখিয়ে এলেন।আমাদের দু’টো তাবু দেখিয়ে দিলেন। বিরাট বড় একটা খোলা মাঠ। তাতেসারি সারি তাবু। চারদিকে অন্ধকার। দূরের অফিস ঘরে একটা টিমটিমে আলো। অন্ধকারে সাদা তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে। শরণার্থী শিবিরের অফিস থেকে জানিয়ে দিলো আজ রাতে আমাদের খাবার দেয়া যাচ্ছে না। কারণ সন্ধ্যের সঙ্গে সাঙ্গেই শিবিরের খাবার-পাট চুকে যায়। আগামীকাল সব ব্যবস্থা হবে।

কোথা থেকে যেন চিড়া-গুড় জোগাড় হলো। বোধহয় আব্বা বাজার থেকে নিয়ে এসেছিলেন। কেউ খেলো কেউ খেলো না। সবাই ভাগ হয়ে তাবুতে শুতে গেলো। সামনে অনিশ্চয়তা-কাল কি হবে কেউ জানে না। আম্মা বললেন, আমরা কি শরণার্থী শিবিরেই থাকব? ডলি চাচী (এমপি সৈয়দ হয়দার আলীর স্ত্রী) বললেন, রতু ভাই কলকাতা যাবার ব্যবস্থা কি করে হবে? কারণ এমপিরা তো সব কলকাতায়। ওনার স্বামীও সেখানেই ছিলেন বোধ হয়। আব্বা দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন সব ব্যবস্থাই হবে। কারণ শরণার্থীশিবিরে থেকে প্রাণ বাচাৰ বলে তো ভারতে আসিনি। আমি এসেছি স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে। তাঁবুর ভেতরে খড়ের বিছানা পেতে আম্মা আমাদের নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আম্মা ও চাচীদের হাতে অবিরত ঘুরছে তসবিহ। আমরা ছোটরাও পড়ছি দোয়া ইউনুস। আব্বা আম্মা বারবার বলতে লাগলেন সাত্তার কাকার কথা। ঠিকমতো মানকার চর অবধি পৌঁছলেন কিনা। পথে কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?

কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। হঠাৎ একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি

বড়রা সবাই উঠে বসেছে। দূর থেকে কে যেন ডাকছে রতুভাই... রতু ভাই বলে। আব্বা বললেন সাত্তার এসেছে। সত্যিই তাই। সেই রাত্রেই সাত্তার কাকা একটা বাস ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছেন আমাদের নিতে। মানকার চর থেকে কলকাতায় কথা বলে আমাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের নিয়ে বাসে উঠলেন আব্বা। আমরা রওনা দিলাম মানকারচরে। সেখানে সাত্তার কাকার শ্বশুরবাড়ি। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। চেনাপরিচিতজন, নিশ্চিন্ত আশ্রয় সব আছে।

আমাদের নিতে এসেছিলেন একজন অফিসার। সুদর্শন এক যুবক। তার রাতের ঘুম, রাতের বিশ্রাম সম্প্রদান করেছিলেন আমাদের কল্যাণে, একদলশরণার্থীদের জন্যে। আমি আজ যখন সে দিনগুলোর কথা ভাবি, তখনকৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি সেই সামরিক কর্মকর্তার কথা। তার নাম মনেনেই। কিন্তু চোখ বন্ধ করলে তার চেহারাটি এখনও মনে করতে পারি। তার হয়তো মনেও নেই আমাদের কথা। কিন্তু কিশোরী আমি তাকে মনেরেখেছি। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় মনে রাখব চিরকাল।

রিনা পিসি ও বাবলী মাসি

একাত্তরের এপ্রিল মাস। আমরা কলকাতায় পৌঁছেছি। আমার বাবা তার পূর্ব পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এ-ওর কাছ থেকে খবর

পেয়েছে। অনেকেই নিজে থেকে এসেছে দেখা করতে। কলকাতার মতো কসমোপলিটান শহরেও সিরাজগঞ্জবাসীরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত। সে কারণেই আমাদের শরণার্থী হয়ে কলকাতা আসার খবর অনেকেই জেনে গিয়েছিল। প্রতিদিনই কেউ না কেউ নতুন পরিচিতজন আসত দেখা করতে।

আমরা থাকি ভোলা কাকার বাড়িতে। একদিন দুজন মেয়ে এল আমাদের ঘরে। রিনা পিসি ও বাবলী মাসি। রিনা পিসিরা সিরাজগঞ্জের মানুষ। সাতচল্লিশ পরে তার দুভাই কলকাতায় চলে আসে। তার অনেক পরে রিনা পিসিও ভাইদের কাছে চলে আসে। বাবলী মাসি ওর বান্ধবী। এখন আর ঠিক মনে নেই বাবলী মাসি পূর্ব বাংলার কিনা। তবে কথা-বার্তা, চালচলনে ছিলেন খাটি কলকাতার। ছোট করে ছাটা চুল। কাধে পিন করা শাড়ির আচল। পায়ে হিল তোলা জুতা। কাধে ঝোলানো ব্যাগ। মানে দারুণ স্মার্ট। এই দুই বন্ধু বোধ হয় ডাকঘরে চাকরি করত। নারকেলডাঙ্গা ডাকঘর ছিল ওদের কাজের জায়গা। আমরা যেখানে থাকতাম সেই এলাকায়।

রিনা পিসি ও বাবলী মাসি আমার দেখা প্রথম স্বাধীন নারী। সেই বয়সে “স্বাধীন নারী” ব্যাপারটা অবশ্য বুঝতাম না। “নারী স্বাধীনতা” কথাটাও কখনো শুনিনি। তবে পরাধীনতার ব্যাপারটা একটু-আধটু বুঝতাম। না বুঝলেও এই দুই রমণীকে আমার খুব ভাল লাগত। ওরা এলেই আমাদের ভারাক্রান্ত ঘরটায় বেশ একটা হালকা ভাব আসত। তখন না বুঝলেও এখন বুঝি কেন ওদের ভাল লাগত। রিনা পিসি, বাবলী মাসি ছিল

আমাদের দেখা প্রথম স্বাধীন নারী। ওরা চাকরি করত। একা একা সবখানে যেতে পারত-মানে যেত। কি খাবে, কি পোশাক পরবে । সব সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ও সাহস ছিল ওদের । কিন্তু পোশাকে, চলনে-বলনে ছিল মার্জিত এবং বাহুল্য বর্জিত। ওরা অনায়াসে ট্রামে-বাসে চড়ে যাতায়াত করত। ট্রামে-বাসে বা লোকাল ট্রেনে পাশের যাত্রীকে স্রেফ সহযাত্রী হিসেবে দেখতে পারত । দুজনেরই পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ ছিল আন্তরিক।

মাঝে মাঝে তেলে ভাজা আলুর চপ বেগুনী পেঁয়াজির ঠোঙ্গা হাতে আমাদের বাড়িতে আসত ঝলমল করতে করতে । আম্মার সঙ্গে হাসি গল্পে মাতিয়ে তুলত চামু সেন লেন। আমি ওদের পাশে চুপচাপ বসে থাকতাম। আর অবাক হয়ে দেখতাম । ওদের দুজনকেই আমার দারুণ ভাল লাগত। যার অনুভব রয়েছে আজও।

আমার চেনা জগতের যে সব নারী তাদের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই এই বোধ তখনই অনুভব করতাম । ওদের আধুনিকতা আমার মনে দাগ কেটেছিল।

সিরাজগঞ্জের মত আধা শহর আধা গ্রামে সবই ছিল খন্ডিত। হয়ত আজও তাই আছে। আধুনিকতা বা প্রগতির খণ্ড খণ্ড চিহ্ন দেখা যেত। অনুভব করা যেত তার টানাপড়েন। আমার মা-চাচীরা অবিরত নতুন পুরাতনের দ্বন্দে ভুগতেন। পড়াশোনা, চাকরি ইত্যাদি বিষয়গুলো আসতে চাইছিল ওদের জীবনে । কিন্তু বাড়িতে কারো অসুখ করলে কোন ডাক্তার ডাকা হবে, সে সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করত কখন পরিবারের পুরুষটি বাড়ি ফিরবে সে জন্য।

একাত্তরে আমি যা পেয়েছি, তার মধ্যে অন্যতম পাওয়া হল চেতনা, পুরো একাত্তর সাল জুড়ে বারবার আমার চেতনা, আমার বোধের দরজায় ঘা পড়েছে। হয়তো একাত্তর না এলে চেতনার এই দিগন্ত চিরকাল অচেনাই থেকে যেত। আমি হয়তো বা জানতেই পেতাম না আত্মবিশ্বাসের ভরপুর স্বাধীন নারীর চেহারা।

সেই বয়সে এই ব্যাপারটা হয়তো ঠিক তেমন ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখনই মুক্ত স্বাধীন নারীর কথা ভেবেছি, তখনই এই দুই নারীর কথা মনে পড়েছে। এটা আমায় ভাবিয়েছে। আমি বুঝেছি দশ বছর বয়স অবধি যে সব রমণীর সানিধ্যে এসেছিলাম তারা কেউই পরিপূর্ণ মানুষ ছিল না-আর সে কারণেই ওরা দুজন আমার মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে হাজারো রকমের পরিবর্তন এসেছিল। পরিবর্তনের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়েছিল পুরো জাতিকে । ব্যক্তি-জীবনেও এসেছিল অনেক পরিবর্তন। মানুষ জেনেছিল নিজেকে । অনন্ত হৃদয় দুয়ার খুলে গিয়েছিল। যা পড়েছিল চেতনার দ্বারে। শত শত বছরের জীর্ণ পুরোনো ধারণাগুলো মিথ্যে প্রমাণিতও হচ্ছিল ক্রমশ । আর তারই ধারায় একটু একটু করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারী স্বাধীনতার ধারণাটি । আজকের এই আমি, যে নিজেকে মানুষ ভাবতে পারছি-তার

মুলে অনেকটাই বোধ করি একাত্তরের কলকাতা । আর কলকাতার সেই দুই আত্মবিশ্বাসী স্বাধীন নারী রিনা পিসি ও বাবলী মাসি।

সহায়ক সমিতির মঞ্চে বাবার বক্তব্য

কলকাতার গড়ের মাঠের একপাশে বিশাল মঞ্চ করে নিয়মিত অনুষ্ঠান করত "বাংলাদেশের সহায়ক সমিতি"। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত সব বুদ্ধিজীবী, শিল্পীদের সঙ্গে বাংলাদেশের শরণার্থী শিল্পী, লেখক, রাজনীতিবিদরা মিলে প্রতিদিন নানা রকম অনুষ্ঠান করতেন সেই মঞ্চে দেশের গান হতো। কবিতা আবৃত্তি হতো। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব সব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখত বাংলাদেশের শরণার্থীরা। মঞ্চের সামনে মাঠে বসে থাকত হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু। এদের মধ্যে যেমন থাকত শরণার্থীর দল। তেমনি থাকত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা। মঞ্চের একপাশ ঘিরে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। সেখানে বাংলাদেশের ভিতরে পাকসেনাদের হত্যাযজ্ঞের অনেক ছবি ছিল, মনে আছে। আরও ছিল ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের দুঃখময় জীবনযাপনের ছবি। যে সব ছবি দেখে লোকে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে দেখেছি।

কলকাতায় যাবার পর আমরাও যেতাম বাবার সঙ্গে সহায়ক সমিতিরসেইসব অনুষ্ঠানে। ওখানেই সহায়ক সমিতির অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো বাবার। ওরা যখন জানতে পারল আমার বাবা সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আমরা সম্প্রতি এসেছি দেশ থেকে । তখনই বাবাকে অনুরোধ জানাল সহায়ক সমিতির মঞ্চে এসে কিছু বলার জন্য।

আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতু বরাবরই খুব ভালো বক্তৃতা করেন। তা সেটা যে কোন বিষয়ের ওপর হোক না কেন। আর রাজনৈতিক বক্তৃতায় তার সমতুল্য বক্তা আমি সত্যি কম দেখেছি। যেহেতু উনি নাটক করতেন । আবৃত্তি করতেন। সে কারণে স্বরযন্ত্রের

ওপরে ছিল তার অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ । বক্তব্য রাখতেন সুস্পষ্ট এবং জোরালভাবে । আর অতি সহজেই দর্শক ও শ্রোতাদের একাত্ম করে ফেলতেন নিজের সঙ্গে।

বাবা তার জীবনের এক স্মরণীয় বক্তৃতা করলেন সেদিন । বক্তৃতা শেষে নিচে নেমে আসতেই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের একজন কর্তাব্যক্তি এসে পরিচিত হলেন বাবার সঙ্গে। ঠিক হলো আমার বাবা পরের দিন আকাশবাণীতে সাক্ষাত্কার দিবেন। বাবা রাজি হলেন। এখন আমার আর সেই সাক্ষাৎকারের সবকিছু মনে নেই। আর তখন তো ডায়েরি লিখতেও জানতাম না। কিন্তু স্মৃতিতে যতটুকু আছে তা হলো বাবা তার সাক্ষাৎকারে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার কথা বলেছিলেন । আকাশবাণীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন। আমাদের দেশের কৃষক তাদের পাট পাকিস্তানি সরকারের কাছে বিক্রি করছে না। বাঙালিদের পাট না পাওয়ায় সব পাটের কল বন্ধ হয়ে গেছে বা যাবে। সেদিন বাবার সঙ্গে একই অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্রনেত্রী অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী। দুজনের সাক্ষাৎকার একই অনুষ্ঠানে ছিল। সম্ভবত পরপর দুদিন প্রচারিত হয়েছিল সেই সাক্ষাৎকারটি । যোগাযোগ ছিনন হয়ে যায়। আমরা যে কলকাতা পৌঁছেছি তা জানাবার কোন উপায় ছিল না। এই সাক্ষাৎকার প্রচারে দেশের ভেতরের আত্মীয়, বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্মীরা আমাদের কলকাতা পৌঁছার খবর আপনা আপনি পেয়ে গেল। পরে যখন আমার কাকারা ভারতে শরণার্থী হয়ে এলেন তখন তাদের কাছেই জানা গেল সব। আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতুর গলার স্বর আত্মীয় বন্ধুদের এত চেনা যে নাম না প্রচারেও চিনতে কোন অসুবিধা হয়নি কারো।

বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির মঞ্চে সেদিনের সেই বক্তৃতা বাবার (আনোয়ার হোসেন রতু) জীবনের এক মাইলফলক । আবেগে ভরপুর হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ। সেদিন মহাসাগরের ঢেউ তুলেছিল উপস্থিত জনতার বুকে । কয়েক হাজার মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল মরণপণ যুদ্ধে। যা ভাবলে আজও আমি আনন্দিত হই। একজীবনে এত বড় কাজ করার সুযোগ তো সত্যিই বারবার আসে না।

'৭১-এ বব ছাঁটের চুল

বহু পথ পাড়ি দিয়ে বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে প্রায় এক মাসের দীর্ঘ যাত্রা শেষে অবশেষে এসে কলকাতায় থিতু হয়ে বসতে পারলাম আমরা। কলকাতায় পৌঁছে আমার বাবা-মা তাদের পরিচিতজনদের খোজ করতে চেষ্টা করলেন। খুব বেশি খুঁজতে হলো না। সিরাজগঞ্জবাসী যারা উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে '৭১ পর্যন্ত ভারতে চলে গেছেন তারা প্রায় সবাই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। দু-একজনের সঙ্গে দেখা হতে কথা হতেই অন্যদের খবর পাওয়া যেতে লাগল । অনেকে এসে নিজে থেকে দেখা করে যেতে লাগল । এ ছাড়াও শরণার্থীদের মধ্যেও অনেক আত্মীয়-বন্ধুদের দেখা পাওয়া গেল। আর যেহেতু আমার বাবা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করছিলেন। সেহেতু দেশ থেকে যারা শরণার্থী হয়ে গিয়েছিল তাদের খোজ পেতে কষ্ট হলো না। খবর পেতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই এসেই আমাদের সঙ্গে দেখা করত। এদের মধ্যে অনেকের কথাই মনে পড়ে। রিনা পিসী অনেক দিনের কলকাতাবাসী হয়েও সিরাজগঞ্জকে ভুলতে পারেননি। তা আমাদের সঙ্গে আন্তরিক ব্যবহারেই বোঝা গেল । রিনা পিসী সঙ্গে নিয়ে এলেন বাবলী মাসীকে।

হঠাৎ কলকাতার চামু সেন লেনের সেই গলির মধ্যের বাড়িতে আমাদের কাছে বেড়াতে এলেন আমার বাবার সম্পর্কিত বোন। ঠিক কেমন বোন তাও জানি না। আগে কোনদিন দেখিওনি। অবশ্য আমার আব্বা-আম্মা ঠিক চেনেন। উনার স্বামী বাংলাদেশে (মানে পূর্ব পাকিস্তানে) বৃটিশ টোবাকোতে বড়দরের চাকরি করতেন। সে অবস্থায় যুদ্ধ শুরু হতেই ভারতে চলে আসেন। বিটিসি অন্তর্জাতিক কোম্পানি হওয়াতে কলকাতা অফিস থেকে উনাদের সাহেবপাড়ায় ফ্লাট আর মাসিকভাতা বরাদ্দ করে কোম্পানি।

উনাদের কোন অসুবিধা নেই। আমাদের ফুপা মানুষটি নেহায়েৎ গোবেচারা এবং যথেষ্ট ভদ্রলোক। আমার আব্বা-আম্মার তাকে পছন্দ হয়েছিল বলা বাহুল্য। ফুপুটিও ভাল ধরনের মানুষ। তবে স্বল্প শিক্ষিত হওয়াতে সর্বদাই অতি স্মার্ট হওয়ার একটি হাস্যকর প্রচেষ্টায় রত। তখন এবং পরেও দেখেছি কেমন করে যেন উনার ধারণা হয়েছিল যেহেতু স্বামী বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করেন সেহেতু উনার ভুল ইংরেজি, ভুল বাংলা ও ইংরেজির স্টাইলে বাংলা বলার অধিকার রয়েছে। আর উনি সেটা ষোলআনা করতেন। সেই সাথে স্বামীর ওপরওয়ালাদের গল্প। তবে এমনিতে মানুষটি বেশ ভাল ছিলেন।

আমরা কলকাতায় থাকতে ঘনঘন আমার মায়ের কাছে আসতেন। এখন বুঝি যতই আরামে থাকুন শরণার্থী হওয়ার গ্লানি ও সেই সঙ্গে নিরাপত্তাহীনতা তো ছিলই। এছাড়াও আমাদের বাসায় তো সমসময় আদর।

একদিন আমাদের ফুপা তার বাড়িতে যেতে দাওয়াত দিলেন। আম্মা আবার কখনই কারো বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া খুব একটা পছন্দ করতেন না। দেশে থাকতেও আমার মা কারো বাড়িতে যেতেন না খুব একটা। তাতে আবার '৭১-এর সেই সময়। অবশ্য আম্মার জন্য কলকাতা ঠিক পরবাস নয়। আমার নানী আজন্ম কলকাতাবাসী। আম্মার জন্ম কলকাতায় আর শৈশবকালও কেটেছে সেখানে। তবুও '৭১-এ কলকাতায় আম্মা পরবাসীর মতই থাকতেন।

না না কারেও একদিন আমরা গেলাম ফুপুর ফ্ল্যাটে। কেন্দ্রিয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল ভবনের একটি অংশে তাদের বাস। সেই আমি প্রথম সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশন দালান দেখলাম। ফ্ল্যাট শব্দটার মানে অবশ্য তখন জানতাম না। এখন বুঝতে পারি ওটা ফ্ল্যাট ছিল। এ দালানের অন্যান্য অংশে সম্ভবত বিদেশিরা থাকত।

ট্যাক্সি করে এ বাড়িতে নেমে লিফট দিয়ে উপরে উঠলাম। কলিংবেল টিপে তবে দরজা খুলল। আমি বড় হয়েছি যেখানে সে বাড়িতে সদর দরজা রাতে চার-পাঁচ ঘন্টার জন্য বন্ধ হওয়া ছাড়া সর্বদাই খোলা থাকত। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো ঘর, মাঝখানে বিশাল উঠান, বাড়ির পিছনে ফলের বাগান, পাশে পুকুর। সব মিলিয়ে একটা বাড়ি। অবশ্য আধুনিক ব্যবস্থাদি দেখে মজা পেলাম খুব।

ঘরের ভেতরে ঢুকে তো হাঁ। সোফা, টেবিল, কার্পেট এক এলাহি ব্যবস্থা। আমরা বসার পড়ে এলেন ফুপু। তাকে দেখে আমার মা আঁতকে উঠে প্রশ্ন করলেন, একি তোমার মাথার কি হাল!

ঘরের সবাই একযোগে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আমার আম্মা আবার বললেন, চুল কি হলো? আমি দেখলাম ফুপুর পিঠের ওপরে ছড়ানো চুল ঘাড়ের উপরে উঠে গেছে। ফুপু কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, হ্যা, মানে বৰ করে ফেললাম আরকি। আমি বুঝতে পারলাম এরকম ছোট করে ছাঁটা চুলকে বব ছাট বলে।

আমার আম্মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন হঠাৎ চুল কাটতে গেলে কেন? অবশ্য আম্মার অবাক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। একে বাঙালি তারওপর শরণার্থী। এর মধ্যে চুলের ছাট নিয়ে সময় ব্যয় করার মতো মন কি করে হলো এটাই বোধ হয় আম্মার মনের কথা ছিল। যা হোক অপ্রতিভ ফুপু জবাব দিলেন, "হ্যা ভাবী নারকেল তেলের যা দাম তাই বিউটি পার্লারে গিয়ে চুলটা ছেঁটেই ফেললাম"।

অপু, দুর্গা আর রঞ্জন

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রথম চার মাস আমরা কলকাতায় ছিলাম। আমাদের বাস ছিল সিরাজগঞ্জের মতো ছোট্ট মহকুমা শহরে। সেখান থেকে একেবারে মহানগর কলকাতা। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ে না। একদিকে শরণার্থী হবার গ্লানি । অন্যদিকে কলকাতা শহরের চোখ ধাঁধানো রূপ। আমি শৈশবের স্বাভাবিক নিয়মে মুগ্ধ হলাম বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, দেখে। বাইরে যেতে পারলে মহানগর কলকাতা দেখে ভুলে যেতাম স্বাধীনতা যুদ্ধের গ্লানি-দুঃখ। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। আমাদের তো বন্দি থাকতে হতো একটা ঘরের মধ্যে । কলকাতায় আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম বাবার বন্ধুর চিরকুমার বড় ভাইয়ের বাড়ির একটা ঘরে। যে বাড়িতে আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেটা ঠিক বাড়ি নয়। আশ্রয়দাতা ভোলা কাকার অটোমেটিক ড্রাই ক্লিনার্স ধোপাখানা। ওদের ভাষায় কারখানা, তারই একটা ঘরে।

আমি জন্মেছিলাম এমন একটা পরিবারে যেখানে '৭১-এর অনেক আগে থেকেই যুদ্ধ অবস্থা বিরাজিত ছিল । জন্মাবধি আমরা সংগ্রামী জীবনে অভ্যস্থ ছিলাম । পকিস্তান সরকারের কোপানলে পড়ে আমার বাবা প্রায়ই পরিবার থেকে বিচ্ছিন থাকতেন। কখনো জেলে তো কখনো "আন্তারগ্রাউন্ডে" । শৈশবে আমাদের অবস্থা ছিল কিছুটা যাযাবরের মতো । তবুও তার মধ্যেও অনেকটা মুক্তি ছিল। স্কুলে খেলার মাঠে, বাড়িতে চাচাতো মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে হইচই । নিশ্বাস ফেলার মতো অনেকটা বড় আকাশ ছিল । এ ছাড়াও খাওয়া-পরার কষ্ট তো কাকে বলে তা জানতাম না। বরং বাবা-মা কাছে নেই বলে সবখানেই আলাদা কদর পেতে অভ্যস্থ ছিলাম।

কিন্তু কলকাতার যে জীবন । সেখানে মুক্ত হয়ে নিশ্বাস ফেলার জায়গা কোথায়?

একটা ঘরের মধ্যে আমরা চার ভাইবোন, মা আমার মায়ের কাজের মেয়ে রোকেয়াবু- সেক্টর থেকে এসে মাঝেমধ্যে বাবাও থাকতেন। এর মাঝে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করল মুক্তিযোদ্ধারা। ঘরের সামনে একটা বারান্দা মতো জায়গা সেখানে রান্না-খাওয়া আর মুক্তিযোদ্ধাদের শোবার ব্যবস্থা। এরকম একটা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আলোর কণা হলো রঞ্জন। কলকাতায় আমরা যার বাড়িতে আশ্রিত ছিলাম। সেই বাড়ির একদিকে থাকত রঞ্জনের পরিবার। মাসীমা, রঞ্জন আর রমেন। রঞ্জন আমার সমবয়সী। পড়ত আমার থেকে এক ক্লাশ উপর ষষ্ঠ শ্রেণিতে। রঞ্জন খুব সিরিয়াস টাইপের ছেলে ছিল। সবসময়ই একটা গম্ভীর ভাব। কথা বলত কম । পড়ত বেশি। একেবারে আমার উল্টো। তবুও কেমন করে যেন একদিন রঞ্জন আমার বন্ধু হয়ে গেল। রঞ্জন তার বইয়ের ভান্ডার থেকে প্রতিদিনই পড়তে দিত নানা ধরনের বই । পড়তে শেখার পর থেকেই পড়ার বইয়ের থেকে বেশি পড়তাম গল্পের বই। লাইবেরি থেকে বই আনতে যেতাম মায়ের সঙ্গে । তখন নিজের জন্যও মাঝে মাঝে বই পেতাম। কিন্তু মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জের পাঠাগারে ছোটদের পড়ার মতো কটা বইই বা থাকত। কলকাতায় যাবার আগে আমি কখনো কমিক্স পড়িনি । রঞ্জন আমায় প্রথম কমিক্সের বই দিল পড়তে। কমিক্স আর কার্টুন চিনলাম। কিন্তু কমিক্সে আমার যেন খুব একটা নেশা হলো না। এর মধ্যে রঞ্জন তার রাশিয়ান রূপকথার বইটা পড়তে দিল একদিন। সেই থেকে আজও সিন্ডারেলা আমার প্রিয়। রাজকুমারের জন্য "সিন্ডারেলা" যতটা দুঃখ পেয়েছিল। তার থেকেও বেশি দুঃখ পেলাম আমি । রাজকুমারকে ফিরে পেয়ে "সিন্ডারেলা" যতটা খুমি হয়েছিল তার থেকেও বেশি খুশি হলাম আমি আর রঞ্জন । "সিন্ডারেলা' পড়তে পড়তে আমি আর রঞ্জন বন্ধু হলাম ।

রঞ্জন আমায় "নকশাল' কাকে বলে বোঝাল। কাকড়ার চচ্চরি খেতে উৎসাহিত করল। ভোলা কাকার বিশাল হিংস্র বিদেশি কুকুরের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিল। ওর মায়ের পূজার ফুল থেকে চুরি করে পদ্মফুল এনে দিল। প্রতিদিন বড় রাস্তার ধারে ট্রাম দেখাতে নিয়ে গেল। আমায় নিয়ে ছড়া লিখে অবাক করে দিল। বন্ধু হয়ে রঞ্জন আমায় মহানগর কলকাতায় থাকার কষ্ট ভুলিয়ে দিল।

চৌদ্দ আগষ্ট আমার জন্মদিনটা বরাবরই আমার মা-বাবা খুব ঘটা করে পালন করতেন। মেয়ে হয়েও এই অতিরিক্ত পাওনা পেয়েছিলাম। কোন্ সুবাদে জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটত । মা-বাবা, মামারা, চাচারা, মামাতো, চাচাতো ভাইবোনেরা প্রত্যেকে চৌদ্দ আগস্টের উৎসবের জন্য যেন সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত । '৭১-এর সেই অগ্নিঝরা বেদনাবিধুর সময়ে তো আর জন্মদিনের ঘটা করার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু কলকাতা শহরের সেই দুঃসময়েও আমার মা-বাবা ভুলে যাননি তাদের প্রথম সন্তানের জন্মদিন। চৌদ্দ তারিখ বিকেলে বাবা আমাকে একটা বড়সড় উপহারের প্যাকেট দিলেন ।

উপহারের ওজনদার প্যাকেট হাতে নিয়ে আমি তো অবাক। কারণ ছোট হলেও শরণার্থী পরিবারের আর্থিক টানাটানিটা বুঝতে পারতাম। আর এক ঘরে পুরো পরিবারের বসবাস। তাই মা-বাবার আলোচনা থেকে পরিবারের অর্থ কষ্টের দিকটা জানা হয়ে গিয়েছিল।

জন্মদিনের উপহারের সেই ওজনদার বিশাল প্যাকেট আমার জীবনে এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিল। আমাকে পৌঁছে দিল সাহিত্যের এক অনির্বচনীয় আনন্দের জগতে। যেখানে আমার প্রথম দেখা হলো "অপু আর দুর্গার" সঙ্গে। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী পড়ে আমি সত্যিকারের সাহিত্যের স্বাদ পেতে শুরু করলাম। যার আরম্ভ হয়েছিল রঞ্জনের দেয়া রাশিয়ান রূপকথা দিয়ে। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তীসিহ অনেকের লেখা বই ছিল আমার জন্মদিনের উপহারে। পড়ার জগতে ডুব দেয়া সেই তখন থেকেই।

যুদ্ধ ধ্বংস করে। যুদ্ধ মানেই অসংখ্য মৃত্যু। পাশাপাশি যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় নতুন চেতনা। গড়ে ওঠে নবজীবন। যুদ্ধ জীবনকে নতুন চোখে দেখতে শেখায়। জীবনের জন্য ভালবাসা তৈরি হয়। মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা আবেগ বেরিয়ে আসে সামনে। মানুষ উপলব্ধি করে নিজেকে, দেশ ও জাতিকে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধও জাতি চিনতে শিখেছিল নিজেকে। অনেক বড় বড় অর্জন আমরা করেছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে। স্বজনের মৃত্যু দিয়ে তৈরি হয়েছে জাতীয় পরিচয়। '৭১-এর যুদ্ধের নয় মাসে আমি অর্জন করেছিলাম রঞ্জনের বন্ধুত্ব যা আজও আমাকে সহজে বন্ধুতে আগ্রহী করে। আমি পেয়েছিলাম "অপু" "দূর্গা" আর "সিন্ডারেলা" কে যা থেকে বই আজও আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তপন কাকা

আমরা তখন কলকাতার চামু সেন লেনে ভোলা কাকার ধোপাখানার একটা ঘরে থাকি। বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে কলকাতা বাসের। মাঝে মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে কেউ কেউ আসে । দু-চারদিন থাকে তারপর চলে যায়। যারা আসত তাদের বেশির ভাগই যুদ্ধে চলে যেত। এরা আসত আব্বার কাছে জানতে কোথায় কীভাবে যুদ্ধে যোগ দেবে। আমাদের সাথে বেশি থাকতে পারত না। কারণ থাকার জায়গার অভাব। একটা ঘরে আমরা ক'ভাইবোন, আম্মা, রোকেয়াবু গাদাগাদি করে থাকতাম । ঘরের সামনে বারান্দায় আম্মা রান্না করতেন । একদিন আমার ছোট মামা এলেন পাকশী থেকে । তবে উনি অবশ্য আমাদের কাছে ঠিক আসেন নি। এসেছিলেন নানীর কাছে। নানী তো কলকাতাবাসিনী ছিলেন আজীবন। ওখানেই চাকরি করতেন । স্কুল শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। আব্বা বেশি সময় সীমান্তে কাটাতেন। আর কলকাতায় থাকার সময়টুকু থিয়েটার রোডে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে। আমরা তাঁর দেখা খুব একটা পেতাম না।

আম্মা আমাদের সামলানোর ফাঁকে ফাঁকে গড়ের মাঠে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কার্যক্রম দেখতে যেতেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে । ওখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হতো।

একদিন দুপুরবেলা আচমকা তপন কাকা এলেন আমাদের বাসায়। ধুলায় মলিন রুক্ষ চেহারা। অনেকদিনের অনাহার অর্ধাহারে একেবারে বিধস্ত অবস্থা। আম্মা তো তপন কাকার হাল দেখে আঁতকে উঠলেন ।

তপন কাকা আব্বার চাচাতো ভাই । ছোট চাচার ছেলে । এক সময় আব্বা তার ছোট চাচার সঙ্গে থাকতেন। সে কারণে তপন কাকাদের আব্বা আম্মা চাচাতো ভাই না বলে

শুধু ভাই বলতেই পছন্দ করতেন।

সুস্থির হয়ে বসে তপন কাকা জানালেন। বেশ কিছুদিন আগে কাকা কলকাতা পৌঁছেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করতে চেয়েছিলেন এসেই। কিন্তু ব্যবস্থা করতে পারেননি। পরে ঘুরতে ঘুরতে থিয়েটার রোডে যান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে দেখা করেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে রতুর ভাই বলতেই তিনি চিনতে পারেন। অবশ্য মনসুর আলী সাহেব আগেও কাকাকে দেখেছিলেন। একবার আব্বা "আজকাল" নাটকটি করেন। সেখানে তপন কাকা ছোট ভাই অমলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। আব্বা অমলের বড় ভাইয়ের চরিত্রে ছিলেন। সেই নাট্যানুষ্ঠানে মনসুর আলী সাহেব বোধ হয় প্রধান অতিথি ছিলেন।

চিনতে পেরে তিনি তপন কাকাকে দুইশ' পঁচাত্তর টাকা দেন। আর দেন আব্বার ঠিকানা। সেই টাকা সম্বল করে কাকা আব্বাকে খুঁজে বের করেন। তপন কাকা যুদ্ধে যোগ দিতে চাইলেন। কিন্তু আব্বা রাজি হলেন না। আব্বা তাকে বোঝালেন যে তুমি শিল্পী, তোমার যুদ্ধের হাতিয়ার হবে শিল্প। সবাই অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার দরকার নেই। বরং সংগ্রামী শিল্পীদের দলেই তোমার প্রয়োজন বেশি।

আব্বা তপন কাকাকে সঙ্গে নিয়ে মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের লোকজনের সঙ্গে দেখা করে কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়ে তপন কাকা "রক্তহীন প্রাণ" নামের একটি নাটকে নায়কের চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে রক্তহীন প্রাণ নাটকের নায়ক একজন মৃত মুক্তিযোদ্ধা। যে তার সহযোদ্ধা ও দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। পরে চৌদ্দ আগষ্ট থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে কাকা "বিক্ষুব্ধ বাংলা" নামের একটা নাটকে অভিনয় করে খুব নাম করেন। তাজউদ্দিন আহমেদ সেই নাটক শুনে কাকার খুব প্রশংসা করেন, যা কাকাকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছিল। আব্বাও খুব খুশি হয়েছিলেন তার ভাইয়ের সাফল্যে। সব বাঙালির মত

আমরাও স্বাধীন বাংলা বেতার খুব মন দিয়ে শুনতাম। কিন্তু যখন তপন কাকার ভাল কাজ হতো তখন আব্বার চোখে একটা অন্যরকম খুশির আভা দেখতে পেতাম। তারও পরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আগে সব সময় তপন কাকার গলা পাওয়া যেত। প্রথম তপন কাকার গলায় শোনা যেত বজ্রকণ্ঠ, তারপরেই শুরু হতো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। পঁচাত্তর-এর আগষ্ট পর্যন্ত এটা শোনা গেছে। এরপরে তো তপন কাকা বাংলাদেশে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন বিজ্ঞাপনে জগতে। শুধুমাত্র গলার স্বরে গোটা দেশকে জয় করে

নিলেন মাজহারুল ইসলাম তপন।

'৭১-এর আগুন ঝরা সেই দিনে আব্বা যদি তপন কাকাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে না নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে নিয়ে যেতেন নিজের সঙ্গে, তবে কি হতো কে জানে। স্বাধীনতা যুদ্ধ যে শুধুমাত্র অস্ত্র হাতেই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই । গানে, কাব্যে, নাটকে, অভিনয়ে লেখায় সবখানে একসঙ্গে যুদ্ধ না করলে যে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হবে না। এ কথাটা আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আমরা পেয়েছি বজ্রকন্ঠের এই অমর শিল্পীকে । শিল্পীর অবদানের হিসেব করবেন এঁতিহাসিকেরা । আমি এক সাধারণ বাঙালি মেয়ে মনে মনে শতবার ধন্যবাদ জানাই আনোয়ার হোসেন রতুকে। যার দূরদর্শিতায় '৭১-এর দুঃসময়ে মেঘে ঢাকা বাংলার শিল্পের আকাশে উদয় হয়েছিল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যার আওয়াজে অনুপ্রাণিত হয়েছিল রণাঙ্গনে বাংলাদেশের অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা।

শরণার্থী নানান দেশে, নানান রূপে

আমি তখন আমার স্বামীর কর্মস্থল কম্বোডিয়া রাজধানী নমপেন শহরে। আমার স্বামী জাতিসংঘের কর্মকর্তা হিসেবে সেখানে কর্মরত। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের আঘাতে কম্বোডিয়া ক্ষত-বিক্ষত। মাত্র বিশ বছর আগে আমাদের দেশে যুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই যুদ্ধ কি তার একটু ধারণা আমার ছিল।

একদিন অফিস ফেরত মোজাম্মেল জানাল আগামীকাল থেকে তার দায়িত্ব বাড়ল। শরণার্থীদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা। যে সব কম্বোডিয়াবাসী শরণার্থী হিসেবে পাশের দেশগুলোতে চলে গেছে তাদের জাতিসংঘের তদারকিতে দেশে ফেরত আনা হবে। আর সেই দায়িত্ব পড়েছে মোজাম্মেলের ওপর। শরণার্থী বহনকারী প্রথম ট্রেন যেদিন আসবে সেদিন তাদের রিসিভ করতে উপস্থিত থাকবেন জাতিসংঘ মিশন প্রধান আকাশি ও কম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহানুক।

খাবার টেবিলে বিশাল মানচিত্র বিছিয়ে যখন মোজাম্মেল শরণার্থীদের কি করে নিরাপদে ফেরত আনা যায়, ফেরত আসার পর তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে সহকমীরদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত তখন আমার মনের বীণায় ঝংকার তুলে বেজে চলছে “রিফিউজি” শব্দটি।

'৭১-এর যুদ্ধকালে নয় মাস রিফিউজি হিসেবে আমরা বাস করেছি ভারতের নানা স্থানে। প্রথমে মেঘালয়, সেখান থেকে আসামের মাইনকার চর হয়ে কলকাতা-আবার সেখান থেকে মাইনকার চর। আর তাই রিফিউজিদের যন্ত্রণা আমি অনুভব করতে পারি। দেশে ফেরার আকুতি কেমন তার কিছুটা আমার চেনা। রিফিউজিদের মানসিক অবস্থা বোঝাতে একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমি যখন দ্বিতীয়বার জাপানে গেলাম সেবার

আমার ছেলেমেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। দশ দিন ধরে আবিশ্রান্ত বেড়ানো শেষে যেদিন ফেরত আসব সেদিন হোটেলে আমাদের জাপান প্রবাসী বন্ধু কাজী লাল আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করল জাপান কেমন লেগেছে? মেয়ে জানাল ভাল, খুবই ভাল। ডিজনিল্যান্ড দু'ভাইবোনেরই ভাল লেগেছে। কারণ ওটাই ওদের দেখা প্রথম ডিজনিল্যান্ড। কিন্তু আমার মেয়ে মৌটুসি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে চায়। আমরা জানতে চাইলাম কেন? উত্তরে ছোট্ট মৌটুসি জাপানের সবকিছুই ভালো তবে কোনো কিছুই তো আমাদের না। ঠিক এভাবেই ভাবে রিফিউজিরা, যত ভালই থাকুক না কেন। আমাদের শব্দটি সেখানে নিষিদ্ধ। সবসময় এই বোধ তাড়িত করে ফেরে। এই দেশ আমাদের না, চারপাশের এই সব মানুষ আমাদের না। এখানে আমরা অনাহুত। এখানে আমরা অতিথি নই, কৃপার পাত্র। '৭১ থেকে একানব্বই, চুরানব্বই, পঁচানব্বই শরণার্থী দেখেছি বারবার । দেখেছি তাদের আনন্দ-বেদনা। '৭১-এ বাঙালি শরণার্থীদের মধ্যেও ছিল ভাগ্যবানেরা । যাদের ছিল একটা ভিন্ন শ্রেণী, ভিন্ন জীবন। শরণার্থীদের মধ্যেও নানা রূপ নানা ভেদ ছিল। ভারতে এক কোটি শরণার্থীর বেশির ভাগ যখন আশ্রয় ক্যাম্পে ক্ষুধা, অভাব, অসুখের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। তখন কোন কোন শরণার্থী পরিবার বিলাসে গা ভাসিয়ে প্লেনে চড়ে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি দেখে বেড়াতে লাগল। আমার বাবা বাংলাদেশ থেকে তৎকালীন সংসদ সদস্য সৈয়দ হয়দার আলীর বিশাল পরিবারকে বহন করে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা পৌঁছে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম । ওনারা গিয়ে উঠলেন তাঁদের আত্মীয়দের বাড়ি। আর আমরা ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠলাম ভোলা কাকার ধোপাখানার একটি ঘরে। অসহনীয় কষ্ট। একটা ঘরে এত গুলো মানুষ । ঘরের সামনের এক চিলতে বারান্দায় যখন কয়লার চুলা জবীলানো হতো তখন ধোঁয়ায় ঘরের মধ্যে দম ফেলতে কষ্ট হতো আমাদের। এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমার মায়ের মুখে হাসি ছিল। মনে দেশের জন্য উৎকণ্ঠা আর বেদনা ছিল। কলকাতায় বাসের কষ্ট আমাদের ও আমার মাকে ছুঁতে পারত না। কারণ আমার মা আমাদের বোঝাতে পেরেছিলেন। একটা নিজস্ব পতাকা, একটা নিজের দেশ পেতে পৃথিবীর সব জাতিকেই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আর তাই আমরাও যে কিছুটা দুঃখে থাকব এটাই স্বাভাবিক।

শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা সম্পর্কে আমরা জানতে পারতাম বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কর্মশিবির থেকে। সম্ভবত গড়ের মাঠের কোণে ঘেরাও করে বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি আলোকচিত্র প্রদর্শনী করে। যেখানে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ছবি ও পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিভিন্ন ছবি স্থান পেয়েছিল। একটি মঞ্চ ছিল সেখানে নিয়মিত গান, বক্তৃতাসহ নানা রকম অনুষ্ঠান হতো। আমরা যেতাম নিয়মিত ট্রামে চড়ে । কারণ ট্রামে যাতায়াত খরচ ছিল সবচেয়ে কম। কলকাতা যাবার পরের সৈয়দ হায়দার

আলীর পরিবারের সঙ্গে আমাদের দেখাশোনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দূরত্বের কারণে।আকস্মিকভাবে আবার আমরা কাছাকাছি হলাম। ভোলা কাকার ধোপাখানার উল্টোদিকের চারতলা বাড়ির সম্ভবত দোতলার বিশাল ফ্ল্যাট ভাড়া করে এসে উঠল এমপি সাহেবের পরিবার । প্রত্যেক রুমে খাট, আলমিরা, খাবার টেবিল-চেয়ার, রিডিং টেবিল, সবার জন্য আলাদা ঘর সব মিলিয়ে এক বিশাল আয়োজন। হায়দার কাকার বড় দুই ছেলে টিপু ভাইয়া, টিটো ভাইয়া নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র। ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলেটি আমি ও আমার ভাইয়ের বয়সী। ওরা চার ভাইবোন স্কুলে যেতে শুরু করল। নিয়মিত পড়াশোনায় মন দিল। ওদের দেখে মনেই হতো না ওরা ভারতে আশ্রয় নিতে এসেছে। ওরা শরণার্থী। তখনই সেই ছোট্ট বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম তফাৎটা। জেনে গিয়েছিলাম শরণার্থীর অনেক রূপ। একদল যখন ক্ষুধায় অসুস্থতায় ধুঁকছে অন্যদল তখন বিলাসে গা ভাসাচ্ছে। সীমান্তে যখন হাজার হাজার কিশোর, তরুণ যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ছেলে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যাচ্ছে। অথচ এসব জননেতারা মুক্তিযুদ্ধে যাবার অনুপ্রেরণা নিয়ে বক্তব্য রাখছেন শরণার্থী শিবিরে শিবিরে। কি ঘৃণ্য এই দ্বৈততা।

আমাদের বাড়ির সামনে হায়দার কাকার পরিবারের স্বাভাবিক জীবন দেখে আমরা ভাইবোনেরা বোধ হয় একটু হীনমন্যতায় ভূগেছিলাম । আর মা-বাবা লজ্জা পেয়েছিল। কারণ এ ধরনের “শরণার্থী পরিবারের” জন্য সব বাংলাদেশিদের কথা শুনতে হতো ।

অবশ্য এ অবস্থা স্থায়ী হলো না। আমরা চলে গেলাম আসামের সীমান্ত এলাকায় মাইনকার চরে। সেখানে আবার শরণার্থীদের আরেক রূপ । শরণার্থী শিবিরে হাজার হাজার মানুষ গিজগিজ করছে। পরনে ছেঁড়া কাপড়, ঠিকমতো খাওয়া নেই। শিবিরে তাবুর সামনে ময়লা দুর্গন্ধ। অবর্ণনীয় দুঃখময় পরিবেশ। তার মধ্যে বাস করেও অসহায় একদল বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বপ্ন দেখছে স্বাধীনতার। আর অন্যদল শরণার্থী তখন বিশাল বিশাল বাড়িতে বসে আরামে আয়েশে দিন কাটাচ্ছে। যখন মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে হাজার হাজার ছেলে একবেলা খেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন রাজনৈতিক নেতারা তাদের ছেলেদের লেখাপড়ায় ব্যস্ত রেখেছেন।

’৭১-এ শরণার্থী হয়ে থেকেছি ভারতে। একানব্বই-এ শরণার্থী দেখেছি কম্বোডিয়ায়। নানা দেশে নানা রূপে। এখন টেলিভিশনের পর্দায় দেখি কসোভোর শরণার্থীদের । এদের আশা, কান্না একই। ব্যতিক্রম শুধু কতিপয় বিপথগামী রাজনৈতিক নেতা আর মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনায়কেরা। যারা জনতাকে ঠকিয়েছে বারবার। দেশে দেশে। যুগে যুগে।

শরণার্থী শিশুর জন্য দেশ চাই

'৭১-এর যুদ্ধকালে আমরা কলকাতায় শরণার্থী। ছোট্ট মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জ থেকে একেবারে মহানগর কলকাতা। কলকাতার ভিড় বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, আলো ঝলমলে দোকান_সবকিছু যেমন অবাক করেছিল। তেমনি সেই শহরের জাকজমক নিজেদের অনাহুত ভাবতেও সাহায্য করেছিল।

আমাদের সিরাজগঞ্জ শহরের বুক চিরে একটা পাকা রাস্তা। বাজারে গুটিকয়েক দোকান। শহরের কোথাও কোথাও বিদ্যুতের বাতি। হাতেগোনা চার-পাচটা মোটরগাড়ি, ব্যস। আর সবকিছুতেই গ্রামের আভাস । আমাদের শহরে সবকিছু ছিল ছোট। কিন্তু বড় বেশি আপন। এ ভাবনা আমার ছোট মনকে নাড়া দিয়েছিল। গঙ্গার বুকে বড় বড় জাহাজ করে উঠেছিল। যমুনার বুকে ছোট ছোট লঞ্চ। বড় বড় গয়না নৌকা। নদীর তীরে বাধা সারি সারি নৌকার জন্য আমার মন কেমন কেমন করত।

কলকাতায় প্রতিটি লোকের ব্যবহারে সহানুভূতিতে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠত আমরা ওদেশে আশ্রয়প্রার্থী। আমরা শরণার্থী। বিশেষ করে নারকেলডাঙা অঞ্চলটা। যেখানে অবাঙালি মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। কিন্তু একথা না বললে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হবে যে কলকাতার বাঙালি, ভারত সরকার, এমনকি উগ্রপন্থী নকশালরাও শরণার্থীদের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং দয়া দেখিয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে এ কথাই অনুভূত হতো যে আমরা ওদের আশ্রিত।

কলকাতার লোকসংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর বিরক্তির আচ মাঝে মধ্যে টের পাওয়া যেত। '৭১-এর শরণার্থীদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, বিবিসি,

ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র শোনা। আর সেই সঙ্গে তুমুল আলোচনা যে কোন দেশ আমাদের যুদ্ধ নিয়ে কি ভাবছে। দেশের ভেতরে কি হচ্ছে। বিশেষভাবে আমেরিকা ও চীন আমাদের নিয়ে কি ভাবছে এ নিয়ে আমার মা-বাবার ব্যাকুলতা আমাকেও ছুঁয়ে যেত। নিজেদের অসহায় মনে হতো । বড়রা যখন মন দিয়ে সে সব আলোচনা শুনতাম । এসব তর্ক-বিতর্ক থেকে আমার কাছে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতা পাবার সাথে আমেরিকার একটা বিশেষ যোগ আছে। ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীরা যতবার আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের নাম উচ্চারণ করত । আজকে তার একশ ভাগের একভাগও আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম উচ্চারণ করি না।

একদিন আমার বাবা এসে জানালের আমেরিকার একজন শক্তিশালী সিনেটর কলকাতায় এসেছেন। বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবেন বলে। বিশ্ববাসীর জানা ছিল যে আমেরিকার সরকার বাংলাদেশের পক্ষে নেই । তবে একথাও সবাই জানত আমেরিকার জনগণের সচেতন একটা অংশ বাংলাদেশের দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যদিও আমেরিকার সহায়তা সহানুভূতির জন্য চাতক পাখির তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম আমরা বাংলাদেশিরা। ঠিক সে সময় একজন সিনেটরের আগমন ঠিক যেন তৃষ্ণাকাতর চাতকের জন্য অঝারধারায় বৃষ্টিপাতের মত।

বাংলাদেশের শরণার্থীরা সিনেটরের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তার যাত্রাপথের পাশে দাঁড়াবে বলে স্থির করেছিল। সম্ভবত লিখলাম কারণ তখন আমি খুই ছোট আমার কাছে ঘটনাটা অতটা স্পষ্ট ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে আমিও চললাম বাবার হাত ধরে। আকাশবাণী, ইডেন গার্ডেন এ সবের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়ালাম আমি ও আমার বাবা। আমার যতদূর মনে পড়ে দুপুরের খাওয়া সেরে সেই সময়ে আমার সবচেয়ে সুন্দর ফ্রক পরে বাবার হাত ধরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে। এক শরণার্থী বালিকা হিসেবে। সাত সমুদ্র তের নদীর পার হয়ে বাংলাদেশের একজন বন্ধু আসছে। যার সাপোর্ট পেলে আমাদের বিশেষ লাভ। বাহ, তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে যাবে। আমরা আবার দেশে ফেরত যেতে পারব। বাবা আমার বোঝালেন পথে যেতে যেতে ।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। ফিসফাস, নানা আশঙ্কা । ঠিক এই পথ দিয়েই যাবেন তো? এমন সময় দূরে দেখা গেল বিশাল এক গাড়ির বহর । আমার বাবা আমায় হাত দিয়ে দেখালেন । এ যে গাড়ির ভেতরে কালো স্যুট পরা ধবধবে ফর্সা উনি হলেন আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাই সিনেটর কেনেডি । আমি প্রাণপণে হাত নেড়ে সিনেটরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম । আমার ছোট্ট হাত তিনি দেখলেন কিনা জানি না। তবে গাড়ির ভেতর থেকে আমাদের দিকে ফিরে হাত নাড়লেন। আমি তো গর্বে আটখানা যে সম্মানিত সিনেটর আমায় দেখেছেন।

এবারে নিশ্চয়ই আমেরিকা আমাদের সহায়তা দেবে। আর গ্রেস বেডেলের মতো বিখ্যাত হয়ে উঠব আমি।

গ্রেস বেডেল সেই মেয়েটা। যে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনকে চিঠি লিখেছিল। যার চিঠি পেয়ে লিংকন দাড়ি রাখেন। আর বিখ্যাত হয়ে ওঠে বেডেল। কোলকাতায় শুকতারা পত্রিকায় পড়া এই সত্যি ঘটনার গল্প আমার আজীবনের প্রিয়।কিন্ত না তা হলো না। আমেরিকা আমাদের যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষনিল না। আমিও রেস বেডেল মতো বিখ্যাত হয়ে উঠলাম না। কিন্তু সিনেটর কেনেডি শরণারীদের দুঃখ লাঘবে সাহায্য করলেন। আর আমাদের পক্ষে তার ব্যক্তিগত সাপোর্ট দিলেন। যা আমেরিকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

কিন্ত আজও আমার মনে হয় সেদিন বাবার হাত ধরে পথের ধারে সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন দেশহীন এই মায়াবী মেয়েটার অবশ্যই একটা নিজের দেশ থাকা উচিত। যেখানে সে তার বাবার হাত ধরে কুন্ঠিত নয় গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উচু করে দীড়িয়ে থাকবে।

মাটির কাছের মানুষ

'৭১-এর আগুনঝরা দিনে আমরা তখন ভারতের আসাম প্রদেশের সীমান্তবর্তী থানা মাইনকার চরে-উল্টা দিকে বাংলাদেশের রৌমারী। আমরা যে বাড়িটাতে থাকতাম তার থেকে কয়েকশো গজ দূরেই ছোট্ট একটা নদী। শুকনো মৌসুমে হাটুপানি হেটে পার হলেই রৌমারী। বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল। মাইনকার চরে শরণার্থীতে গিজগিজ করছে। একসঙ্গে এত মানুষের ভিড় কখনও দেখিনি। শরণার্থী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে বাংলাদেশিরা। অন্যদিকে রৌমারী ইয়ুথ ক্যাম্পেও একই অবস্থা। সবাই অবর্ণনীয় কষ্টে আছে সেখানে। ট্রেনিং শেষে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্রসহ দেশের ভেতরে যাচ্ছে। আহত হয়ে কেউ ফিরছে। কেউ বা ফিরছেই না। তবু দলে দলে নতুন ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য রৌমারী ক্যাম্পে আসছে। রৌমারী ক্যাম্প থেকে আমাদের ছেলেদের ট্রেনিংয়ে পাঠানোর ব্যবস্থাপনার জন্য মাইনকার চরে যে অফিস ছিল। আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতু সেই অফিস পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। সিরাজগঞ্জের মুক্তিযোদ্ধারা অধিকাংশই বাবার অতি পরিচিত । তাই অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা এরকম অনেকেই আমাদের বাড়িতে এসে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় নিত। আবার দুই চারদিন পর চলে যেত। বাবা-মা আমাদের জানালেন নবাগত রুহুল কুদ্দুস সাহেব বঙ্গবন্ধুর সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ভাড়া বাড়িতে প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করেছিলেন। সিএসপি রুহুল কুদ্দুস আমাদের চেনা জগতের আর দশজনের মতোই অতি সাধারণ ধরনের মানুষ-লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি গায়ে একেবারে দেশগায়ের

মানুষদের মতো সহজ আচরণ। এত বড় একজন মানুষ তা বোঝাই যায় না। রুহুল কুদ্দুস সাহেব মুজিবনগর সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম চিফ সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

বাবা যখন রুহুল সাহেবকে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। তখনই তার অতি আধুনিকা সুন্দরী স্ত্রী আমার চিন্তার জগতে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে রইলেন। বাংলাদেশের ছোট্ট মফস্বল শহর সিরাজগঞ্জে আমাদের চেনা জগতের কোন মহিলার সঙ্গেই তাকে মেলাতে না পেরে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমাদের বাসার একমাত্র চৌকিতে থাকতে দেয়া হলো তাদের। যে চৌকিতে শুতো আমার অন্তঃসত্ত্বা চাচাতো বোন মায়া আপা। স্বাভাবিকভাবেই মায়া আপাকে আমাদের সঙ্গে মেঝেতে খড়ের বিছানায় ঠাঁই নিতে হলো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি রুহুল সাহেবের রূপসী স্ত্রী দামি সিল্কের শাড়ি পরে। বিশ্ব-সংসারের ওপর রাজ্যের বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা নিয়ে গম্ভীরমুখে চৌকির ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। কুয়াশা ঢাকা সেই কাকডাকা ভোরে আমার মা ভীষণ ব্যস্ত হাতে সবার জন্য সকালের নাস্তা রুটি-ভাজি তৈরি করছেন। রোকেয়াবু তাকে সাহায্য করছে।

অন্তঃসত্ত্বা রুহুল পরিবার ছাড়া আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল সঙ্গে। ঘরের বারান্দায় খড়ের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে বসে আছে সব। রুহুল সাহেব আন্তরিকভাবে কথা বলছেন সবার সঙ্গে। এগারো বছর বয়সী কিশোরী আমি। সবকিছুই জানার ও বোঝার অনন্ত কৌতুহল মনে। তখন আমার কৌতুহলের লক্ষ্যবস্ত মিসেস কুদ্দুস। উনি কারো সাথেই কোনো কথা বলছেন না। আমাদের বাড়িতে যে ক'দিন তারা ছিলেন। তার প্রায় সবটুকু সময়ই উনি কোলের কাছে পেটমোটা একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে নির্বিকারভাবে চৌকিতে বসেই কাটিয়ে দিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় একদিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। সেই থেকে বাবা ভদ্রমহিলার একেবারেই এড়িয়ে চলতেন। যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু, দেশত্যাগ অসংখ্য শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা কোন কিছুর প্রতিই মহিলার কোন আগ্রহ নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাস তার মত এমন নির্বিকার মানুষ আমি দেখিনি। প্রতিদিন দুপুরে মিসেস কুদ্দুস হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে পেটমোটা ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাশে ঘেরা বাথরুমে গোসল করতে যেতেন। সুবাসিত সাবানের গন্ধ ছড়িয়ে দামি সিল্কের শাড়ি ও ম্যাচিং ব্লাউজ পরে যখন বেরিয়ে আসতেন তখন পলকহীনভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তারপর তার সর্বক্ষণের সঙ্গী পেটমোটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে চৌকিতে গিয়ে বসতেন। শুরু হতো রূপচর্চা। কত রকমের প্রসাধনী যে ব্যবহার করতেন তার ইয়ত্তা নেই। চুল থেকে শুরু করে চোখ, ভ্রু, মুখমন্ডল, গলা, হাত, পা শেষমেশ নখ পর্যন্ত সূচারু রূপে পরিচর্যা করে অবশেষে ক্ষ্যান্ত দিতেন।

মা আমাদের তাকে বিরক্ত করতে মানা করে দিয়েছিলেন তাই কাছে না ঘেঁষে দূর থেকে অবাক বিস্ময়ে সব দেখতাম। যে ক'দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। কারো সঙ্গেই ভাল করে কথা বলতেন না। আমি তার আচার-আচরণে অবাক হয়ে একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, "উনি কি বাঙালি? আমার বাবা তাব স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে হেসে বললেন, "অবশ্যই।" আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তবে উনি এরকম কেন? বাবা আরেক দফা হেসে বললেন, উনি অন্য জাতের মানুষ। সংসারে কিছু মানুষ আছে যারা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর। যে তারা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। উনি তাদেরই একজন। উনি আমাদের মতো মাটির কাছের মানুষ নয়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি-মাটির কাছের মানুষরা কেমন? ভাবতে ভাবতে উঠোনে নামতেই আমার চোখ চলে গেল খোলামেলা রান্নাঘরের দিকে। সেখানে দুটো চুলোয় বড় বড় হাড়িতে ভাত-ডাল তুলে দিয়ে তরকারি কাটছেন আমার মা। পরনে অতি সাধারণ শাড়ি। ঘর্মাক্ত শরীর । সুদৃঢ় প্রত্যয় চেহারায়। আমার মা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রিয় "ছবি ভাবী।" সবারই ভীষণ চেনা একান্ত কাছের মানুষ-একেবারে মাটির কাছের মানুষ।

কোট-টাই পরিহিত মুদি দোকানি

আমরা কলকাতা থেকে মাইনকার চরে চলে আসার আগেই আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা একে একে চলে এসেছিল । ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে শুরু করেছিল হিমালয়ের পায়ের কাছে ছোট্ট থানা মাইনকার চরে । আমরা যখন কলকাতা থেকে এলাম। তখন আমার ছোট কাকা তার স্ত্রীসহ এসে মাইনকার চরে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ছোট কাকী প্রথমবারের মতো মা হতে চলেছেন । আমরা আসায় সবাই খুব খুশি হলো । মায়া আপার শ্বশুরবাড়ির এতো লোক এসে গেল যে এ ছোট্ট গ্রাম মতো জায়গায় ওদের একসঙ্গে থাকার মতো বাড়ি পাওয়া গেল না। আমার দুলাভাই কোথা থেকে কিছু টিন আর দরজা জোগাড় করে একজনের জমিতে বেশ কটি ঘর তুলে ফেলল । আব্বার চাচাতো ভাই বাদশা কাকা এসে ছোট কাকার সঙ্গে থাকতে লাগলেন । খোকা কাকা এসেছিলেন তবে মাইনকার চরে নয়। তিনি চলে গিয়েছিলেন রৌমারী মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে। ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে যোগ দেন।

আব্বার মামাতো ভাই রঞ্জু, মঞ্জু, সঞ্জু, কাকারাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর সাহসী যোদ্ধা হিসেবে খুব সুনাম হয়েছিল ওদের। যদিও রঞ্জু কাকা ও সঞ্জু কাকা দুজনেরই বয়স ছিল খুবই কম। বলতে গেলে সদ্যকৈশোর পেরোনো যুবক । কিন্তু সাহস আর বীরত্বের কারণে সবার ভালবাসা শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন।

আমার ছোট কাকা ও বাদশা কাকা দুজনের কেউই যুদ্ধে গেলেন না। এমন কি এতবড় একটা ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। তার মধ্যে অন্যভাবেও নিজেদের জড়ালেন না। সরাসরি যুদ্ধ ছাড়াও তো কত কাজ ছিল তখন করার মতো। শরণার্থী শিবির, যোদ্ধাদের হাসপাতাল, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করা। সবখানেই মানুষের প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু ওরা দুজনেই কেমন যেন উদাসীনভাবে মুখ ফিরিয়ে রইলেন এই ঐতিহাসিক সময় থেকে যদিও ছোট কাকার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল না কখনো। কিন্তু বাদশা কাকা সরাসরি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। আর মানুষ হিসেবেও খুবই সংবেদনশীল বরাবরই। আমার আব্বাও কেন জানি না তার এই দুই ভাইকে কোন কাজেই ডাকলেন না। বরং একটু দূরেই সরিয়ে রাখতেন যেন। তার চেয়ে আব্বার কাছে অনেক আপন ছিল অজানা-অচেনা মুক্তিযোদ্ধারা। আব্বা-আম্মা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপরিসীম ভালোবাসা ও স্নেহ বহন করেছেন আজীবন।

সিরাজগঞ্জ পাকিস্তানি সেনাদের দখলে আসার পরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের শহরের বাড়িটি ভেঙে তছনছ করে ফেলে। আর রাজাকাররা লুটপাট করে নিয়ে যায় যতটা সম্ভব। এরপর হামলা হয় আমাদের মুগবেলাই গ্রামের বাড়িটি। গ্রামের বিশাল বাড়িটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় পাকসেনারা। বারবার হামলা হতো গ্রামের বাড়িতে। নিরাপত্তার অভাবে ছোট কাকা, বাদশা কাকা ও ছোট কাকী চলে আসেন ভারতে। আব্বা মাইনকার চর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন সবাইকে।

ছোট কাকা ও বাদশা কাকা প্রথম প্রথম কিছুদিন ঘরে বসে, এদিক ওদিক ঘুরে কাটালেন। হঠাৎই বোধ হয় ভাবলেন কিছু একটা করা দরকার। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। দুজন মিলে মাইনকার চরে দোকান দিয়ে বসলেন। ছোট সেই টং দোকানে চাল ডাল লবণ এসব বিক্রি করতে হাট থেকে কিনে আনলেন বোধ হয়। তারপর কখনো পালা করে কখনো দুজনে একসঙ্গে বসতে লাগলেন দোকানে।

তখন শীত এসে গেছে। মাইনকার চরে অবশ্য বেশ আগেই শীত। মানে আমাদের মতো নয়। হিমালয়ের খুব কাছে তো। দুই কাকা কোট-টাই পরে পরিপাটি সেজেগুজে বিকেল বেলা দোকানে এসে বসতেন। তারপর সারা বিকেল। সারা সন্ধ্যা চলতো খদ্দেরের জন্য প্রতীক্ষা। সন্ধ্যা হলেই একটি বড় কুপি জ্বেলে নিয়ে বসতেন। সম্ভবত দোকানের ফাইফরমাশ খাটতে একটা পিচ্চিও রেখেছিলেন। মাঝেমধ্যে আমরাও চলে যেতাম দোকানে বেড়াতে বেড়াতে। লোকজন দোকানের সামনে দিয়ে আশপাশের দোকানে চলে যায়। কিন্তু কাকাদের মুদিখানায় আসে না। আসা-যাওয়ার ফাকে শুধু মাঝেমধ্যে বিস্ময়মাখা চোখে তাকিয়ে দেখে দোকানের দিকে। যেখানে ক্লিনশেভ করা স্যুট-টাই পরা পরিপাটি দুজন দেশি সাহেব সামনে কিছু চাল ডাল নুন হলুদ নিয়ে বসে আছে।

একদিন আমাদের আত্মীয়দের কে যেন ওদের দোকানে গিয়েছিলেন লবণ কিনতে, কিন্তু বাদশা কাকা কিছুতেই পাঁচশ গ্রাম লবণ দাড়িপাল্লায় ওজন দিতে পারছিলেন না। দাঁড়িপাল্লা তার হাতে কেঁপে যাচ্ছিল। এ নিয়ে আম্মা খুব ঠাট্টা তামাশা করলেন তার দেবরদের। কদিন পরে দোকানটা উঠে গেল। কিছুই বিক্রি হলো না; চাল ডাল অবশ্য

ফেলা গেল না। ওসব নিজেদের ভোগেই লাগল।

মাইনকার চর বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতের একটা ছোট্ট থানা সদর । ওখানকার স্থানীয় লোকজনও গরিব। আর আমাদের অবস্থা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। চারদিকে হতদরিদ্র শরণার্থীর দল। হাড়কাপানো শীতে গায়ে একটি জামাই সম্বল। শিবিরে যে কম্বল দেয়া হয়েছে পুরো পরিবার হয়তো একটা বা দুটো কম্বল পেয়েছে। তাতেই জড়াজড়ি করে একসঙ্গে থাকে সবাই । একজনের তাপে অন্যজন একটু ওম পেতে চেষ্টা করে । কাপড় নেই, খাবার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এত নেই, এত হাহাকারের মধ্যে স্যুট-টাই পরা আমার দুই কাকাকে মনে হতো ভিনগ্রহের দুই মানুষ । যাদের দেশের জন্য জাতির জন্য কোন কর্তব্য নেই। ভিন্ন একটি দেশে গিয়ে যেন-তেনভাবে নিজেদের শিকড় প্রোথিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত । আর সে চেষ্টাও কত হাস্যকর, কত ছেলেমানুষিতে ভরা । আমার আব্বা যখন খাকি প্যান্ট, খাকি সোয়েটার গায়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন যোদ্ধাদের সাথে। তখন তার দুই ভাই কোট-টাই পরে দোকান খুলেছেন। কি নির্মম এই বৈপরিত্য। তবুই এটাই সত্যি। একই পরিবারে দুজন মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই চেতনার ।

আমি চোখ বন্ধ করলে এখনো দেখতে পাই কোট-টাই পরে বড় একটা কুপি জেলে শূন্য দোকানে বসে আছেন দুই কাকা। শরণার্থীরা দোকানের ওদের। কিন্তু দোকানে ঢুকছে না। আমরা যেহেতু মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে থাকতাম তাই আমার এই দুই যুবক কাকার যুদ্ধ থেকে আলাদা হয়ে থাকাটাকে ছোট্ট আমিও খুবই করুণার চোখে দেখতাম । আর আজও তাই দেখি। ভীতু সেই যুবকদ্বয়কে সেদিন পুরো মাইনকার চরও সেই চোখেই দেখত বোধ হয়। তখন দোকানের সামেনে থমকে দাঁড়ানো লোকেদের চোখে যে বিস্ময় থাকত। তার সঙ্গে যে খানিকটা করুণাও মেশানো থাকত। তাতে যে কোনই ভুল ছিল না আজ তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

মানবীর প্রেম হেরে গিয়েছিল দেশপ্রেমের কাছে

শরণার্থী হিসেবে আমরা তখন মাইনকার চরে । আমাদের চাচাতো বোন অসাধারণ সুন্দরী মায়া আপাও তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে মাইনকার চরে। যদিও আমরা একসাথে ভারতে যাই। কিন্তু পরবর্তীতে মায়া আপা তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে থাকত। আমরা যাবার কিছুদিন পরেই ধীরে ধীরে আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন মাইনকার চরে চলে আসে। তার মধ্যে মায়া আপার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও ছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই আপাকে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতে হতো। মায়া আপার বর ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। ভারতে গিয়েই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য তখন তিনি একেবারেই সদ্যবিবাহিত। মানে '৭১-এর জানুয়ারিতে বোধ হয় ওদের বিয়ে হয়। মায়া আপার অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমার মাকে ভাবী থেকে চাচী-শাশুড়ী করে ফেলেন আমির দুলাভাই । পরবর্তীতে আম্মা বলেই ডেকে থাকেন, আজও তাই ডাকেন। বাবার রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে আমাদের বাড়িতে ছিল তার অবাধ যাতায়াত । আর স্বভাবগুণে তিনি ছিলেন সবার আপনজন । সত্তর থেকে একাত্তর সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আমার বাবা জেলে থাকা অবস্থায় মায়া আপার বিয়ে হল। আমার মা আর বড় চাচী বিয়ের উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করলেন । মায়া আপারা পাঁচ বোন। ওদের মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন । তাই চাচী হিসেবে আমাদের মা-চাচীরা ওদের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্ববান ছিলেন।

'৭১-এর জানুয়ারিতে আমার বাবা তার দীর্ঘ কারাবাস থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই শুরু হলো যুদ্ধকাল। পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম মায়া আপার শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি। বাবা খবর দিয়ে দুলাভাইকে ডেকে আনলেন খাড়ুয়া গ্রামে।

সেখান থেকে দীর্ঘযাত্রা ভারতের পথে। কলকাতা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গেই গেলাম। কলতাকায় কিছুদিন অবস্থানের পর দুলাভাই যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য সীমান্তে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। তার সঙ্গী হলেন মায়া আপা। আমার মায়ের স্নেহের ছায়া থেকে কষ্টকর ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্তের দিকে ঘর ছাড়ল এই নব দম্পতি। যখন তারা কলকাতা থেকে রৌমারীর দিকে যাত্রা করল, সে যাত্রা ছিল প্রতি পদক্ষেপেই অনিশ্চিত। কোথায় তার শেষ। তা ছিল ওদের অজানা।

মায়া আপা ও দুলাভাই চলে যাওয়াতে আমরা আরো একবার স্বজনহারা হলাম। সদা হাস্যময় দুলাভাই আমাদের খুব স্নেহ করতেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা ওর অভাব ভীষণ অনুভব করতাম। দুর্যোগময় '৭১ এর যাত্রাপথে আমির দুলাভাই ছিলেন আমার মায়ের সবচেয়ে বড় সহায়। আমরা ছোট ছোট চার ভাইবোন হায়দার কাকার চার ছেলেমেয়ে মোট আটজন কিশোর-শিশুর খাবার ব্যবস্থা করা ঘুমানোর জায়গা করা। সবকিছুতেই দুলাভাই আমার মাকে সাহায্য করতেন প্রাণপণে।

কয়েক মাস পরে আমরা যখন মাইনকার চরে চলে এলাম কলকাতা ছেড়ে। তখন মায়া আপা তার শ্বশুরবাড়ির বিশাল পরিবারের সঙ্গে মাইনকার চরেই থাকছেন। দুলাভাই মাঝে মাঝেই দেশের ভেতরে যান। ভীষণ ব্যস্ত। আমরা তো আপাকে দেখে ভীষণ খুশি। আমার মা খুশি অল্প বয়সে নানী হতে যাচ্ছেন বলে। আমাদের মায়া আপা মা হতে যাচ্ছেন।

ডিসেম্বর মাস এসে গেল অসুস্থ মায়া আপাকে আমার মা নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। যুদ্ধকাল হলেও আমার মা তার কর্তব্য ভোলেননি। বাঙালির চিরন্তন রীতি অনুযায়ী মেয়ের প্রথম সন্তান বাপের বাড়িতে হবে। তাই নিয়ম। মা সে নিয়ম পালন করতে ভোলেননি সেই দুর্যোগের দিনেও।

দুলাভাই যুদ্ধে চলে গেলেন। তার প্রিয়তমা আসনপ্রসবা স্ত্রী রয়ে গেল ভারতে । আমার মায়ের সঙ্গে। আমির হোসেন ভুলু তার নতুন বিয়ে করা অসাধারণ সুন্দরী গর্ভবতী স্ত্রীকে ফেলে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধে। যেখান থেকে তার ফেরা ছিল একেবারেই অনিশ্চিত। মানব-মানবীর চিরন্তন প্রেম হেরে গিয়েছিল আমির দুলাভাইয়ের দেশপ্রেমের কাছে। আমির দুলাভাইকে অনেকে আদর করে, ভালবেসে, তুচ্ছ করে আমির পাগলা বলে। এমন পাগলামি এদের মতো দেশপাগলদের পক্ষেই সম্ভব।

গর্ভবতী মায়া আপা যখন সন্তান জন্মদানের যন্ত্রণাময় আর বিস্ময়কর অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। তখন আমির হোসেন ভুলু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে । এই সম্পতি একই সঙ্গে উপভোগ করেছে জন্মদানের আনন্দ-বেদনা । একজন জন্ম দিয়েছে তাদের সন্তান। অন্যজন একটি দেশ।

ভারতের মাটিতে মায়া আপার প্রথম সন্তান মুক্তির সুতীব্র কান্নায় যখন ঘোষিত হলো

তার আগমনবার্তা। বোধ হয় তখনই আমির দুলাভাইয়ের অস্ত্র থেকে ছুটে যাওয়া গুলির শাণিত শব্দে ঘোষিত হয়েছিল নতুন পতাকার আগমন ধ্বনি। জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের। আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা।

আমি বড় হয়ে গেলাম

আমরা তখন আসামের মাইনকার চরে। বাংলাদেশের রৌমারী থানার উল্টোদিকে মাইনকার চর। হিমালয়ের পায়ের কাছে মাইনকার চর একটা পাচমিশালী জনপদ। অল্প পাহাড়ি। বাঙলা, অসমিয়া, হিন্দি ভাষা-ভাষী বিভিন্ন লোক নিয়ে মাইনকার চর। আমাদের দেশে যুদ্ধের শুরু থেকেই অনেক শরণার্থী ঢুকে পড়ে মাইনকার চরে। রৌমারীতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। বাকি প্রায় সব কর্মকাণ্ড মাইনকার চর থেকেই পরিচালিত হতো। '৭১-এর এপ্রিলে আমরা যখন ভারতে গেলাম। তখন মাইনকার চর দিয়েই ভারতে প্রবেশ করি এবং কোলকাতা চলে যাই। আমার বাবা মাইনকার চরে রৌমারীতে যুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন। সে জন্য তাকে বেশির ভাগ সময় রৌমারীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে হতো। মাঝে মাঝে কলকাতা যেতেন প্রবাসী সরকারের কার্যালয়ে। আমাদের দেখাশোনা এলেন। আর মাইনকার চরে আসায়

আমার মা ও যুদ্ধের নানা সহায়ক কাজে অংশ নিতে পারছিলেন । সবকিছু মিলিয়ে কোলকাতা থেকে মাইনকার চরেই আমরা শিফট করে এলাম । আমার বাবাকেও আর আমাদের জন্য চিন্তা করতে হতো না। আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন মাইনকার চরে আশ্রয় পরিবার। এছাড়াও আমার বাবার মামাতো চাচাতো অনেক ভাইবোনও ভারতে এসেছিলেন শরণার্থী হয়ে, যোদ্ধা হয়ে। একে একে সিরাজগঞ্জের এতসব লোকজন মাইনকার চরে এলো যে এটিকে মিনি সিরাজগঞ্জ বলা চলতো।

আমি তখন শিশুকাল অতিক্রম করতে যাচ্ছি। তখনো আমার বাড়ির বাইরে বেরুনোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। বড়জোড় মায়ের চোখ রাঙানি "বেশি দূরে যেও না"। আমাদের ছোটবেলায় এতটা নিরাপত্তাহীনতায় তো ভূগতো না কেউ আজকের মতো। আমার ছোট কাকা, চাচাতো বোন মায়া আপা তার শ্বশুরবাড়ির বিশাল পরিবারসহ আমাদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে একটা বাড়িতে থাকত। ওদের বাড়িতে বা বোনের কাছে। কিন্তু নানাপথ ঘুরে ঘুরে। প্রায়ই ঘুরতে ঘুরতে চলে যেতাম শরণার্থীদের ক্যাম্পে। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। অগণিত হতাশাক্লিষ্ট বেদনায় ভেঙে পড়া বাঙালি জনগোষ্ঠী। অভাব, ক্ষুধা আর রোগ মিলিয়ে এক অসহনীয় দুঃখময় অবস্থা। আমরা ছিলাম হাতেগোনা ভাগ্যবান শরণার্থীদের দলে । যাদের পক্ষে ক্যাম্পের বাইরে মাথা গৌজার ঠাঁই যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল ।

একদিন সকালে যখন মা রান্নাঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নায় ব্যস্ত তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছি শরণার্থী ক্যাম্পে। এলোমেলো বেড়াতে বেড়াতে দেখি একটা তাবুর সামনে জটলা। অন্ধকার শুকনো মুখে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফাস আলোচনা করছে সবাই। কাছে গিয়ে দেখি মাটিতে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। ভীষণ রোগা, অসুস্থ । পরনে ছেঁড়া একটা শাড়ি । বেশ লম্বা চুল। চুলে জট। তাকে ঘিরে বসে আছেন কয়েকজন বয়স্ক মহিলা । একজন ধীরে ধীরে মেয়েটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সবাই মিলে মেয়েটাকে নানা কথায় সান্তনা দিচ্ছেন। "যা হবার হয়ে গেছে তুমি শান্ত হও" । আমি দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভাবছি যা হবার হয়ে গেছে! কি হয়ে গেছে? মেয়েটি তো কোন কথাই বলছে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে । জটলা থেকে কেউ একজন বলল "যদি কাঁনতো তো ভাল হইত।" ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে। নানা জনের নানা প্রশ্নের উত্তরে তাবুর ভিতর থেকে কেউ একজন জানাল একে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি আর্মি ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে এনেছে। মেয়েটির শরীর খুব খারাপ । পাকিস্তানি আর্মিরা ধর্ষণ করেছে একে । এর বাচ্চা হবে। এর পরে মেয়েটির শরীরের বিভিন্ন স্থানে যে সব ক্ষত আছে তার বর্ণনা দিতে থাকল । আমি মেয়েটির স্ফীত পেটের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। ওখানে আর কি কথা হচ্ছিল কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। পাকিস্তানি আর্মি, ধর্ষণ, ক্যাম্প, বাচ্চা হবে এই শব্দগুলো আমার

শিশুকালটাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিল। আমি আমার শিশুকালকে হারিয়ে ফেললাম চোখের পলকে । হঠাৎ চলে গেলাম অনেকটা সামনে। আমি আমার শিশুকাল অতিক্রম করলাম এক দুঃসহতম দুঃখময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। আমি বড় হয়ে গেলাম । সেই অজানা মেয়েটাকে আমি আজও ভুলিনি। '৭১-এর কথা মনে হলেই এখনও আমার মনে পড়ে অসহায় মেয়েটির শুন্যদৃষ্টি। আমি জানি না কি ছিল সেই চোখে-আগুন না জল। কোনটার চিহ্নই নেই। কোথায় হারিয়ে গেল সেই সব মেয়েরা? এই দেশের জন্য যুদ্ধের আগুনে পুড়েছিল যারা? এমন কোন ব্যবস্থাই করা গেল না যাতে বীরাঙ্গনা শব্দটি লজ্জার না হয়ে সম্মানের হয়। বীরাঙ্গনা নাম দিয়ে ওদের চিহিত করার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা তবে সেই নামকরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার পরপর সেই সব অসহায় মেয়েদের নিয়ে যেটুকু আলোচনা হয়েছিল তা ছিল অতি রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন। তারপর এই দীর্ঘকাল আমরা যেন জোর করে ভুলে রয়েছি যে আমাদের সম্ভ্রমকে ক্ষত-বিক্ষত করে এসেছিল স্বাধীনতা। আমরা এড়িয়ে যাই ওদের কথা। যেন ভুলে থাকাতেই স্বস্তি। নির্যাতিত সেইসব মেয়েদের হাতে হাত রেখে কোনো আশারবাণী শোনায়নি কেউ। ওদের নুয়ে পরা মাথা নিচু হতে হতে ছাব্বিশ বছরে বিলীন হয়ে গেছে কোন্ অন্ধকারের অতল গহ্বরে।

যুদ্ধশিশু রায়ান তার মায়ের দেশে এসেছে দেখলাম সংবাদপত্রের পাতায়। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল মাইনকার চরে '৭১-এ দেখা সেই মেয়েটির স্ফীত পেট আর শুন্যদৃষ্টি । শেষ পর্যন্ত কি হয়েছিল মেয়েটির; ছেলে না মেয়ে হয়েছিল তার? তার সমাজ, তার স্বজনেরা কি ব্যবস্থা করেছিল সেই শিশুর? বুকে টেনে নিয়েছিল? নাকি ঘৃণায় অস্বীকার করেছিল? সেদিন না জানলেও আজ তো জানি শিশু শুধু পুরুষের রক্তবীজ নয়; মায়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে ওঠা ভালবাসার ধন। সেই মেয়েটি কি পাকিস্তানি পশুদের কথা ভেবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তার শিশুকে? নাকি চোখের জলে ফোটা পদ্ম ভেবে বুকে তুলে নিয়েছিল? আমার মনে হাজারো প্রশ্নের ভিড়। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের মত ভেসে উঠল মেয়েটির অসহায় মুখ, শূন্যদৃষ্টি। মেয়েটি কি যা হবার হয়ে গেছে ভেবে শান্ত করতে পেরেছিল নিজেকে?

মনের মিল ছিল খুবই কিন্তু মতের মিল হয়নি কখনো

আমার মায়ের বাবার বাড়ির নাম বাণীকুঞ্জ। ইসমাইল হোসেন সিরাজী আম্মার বড় চাচা ছিলেন। আম্মা অবশ্য তাকে দেখেননি তবে নামের মহিমায় হোক আর উত্তরাধিকারের মহিমায় হোক বাণীকুঞ্জের নারীকূল বেশ আধুনিক ছিল। আর বাণীকুঞ্জের তাবৎ লোকজন সিরাজগঞ্জে সম্মানিত ছিলেন। আমার আম্মা তার স্বভাবগুনে বাবার বাড়িতে বেশ খাতির পেতেন। বাণীকুঞ্জের অলিখিত প্রধান ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বড় ছেলে আসাদৌল্লা। সিরাজী-আম্মাদের মিয়াভাই। আসাদৌল্লা সিরাজী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। জেলে গেছেন, পালিয়ে থেকেছেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের একজন হোমড়া-চোমড়া নেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি আবার কবিতা লিখতেন। সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করতেন। একই সঙ্গে তিনি পীর ছিলেন । প্রতি বছর ওরশ হতো নানাবাড়িতে। হাজার হাজার লোক আসত গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগি ও চাল নিয়ে। ওয়াজ, জিকির, মিলাদ হতো। নজরানা পেতেন মামা। একজন মানুষ একাধারে কবি ও পীর-ব্যাপারটা মেলানো কঠিন। আসাদৌল্লা সিরাজী অনেক ভালো গানও লিখেছেন।

যে কোন কারণেই হোক আমার আব্বা-আম্মা খুব প্রিয় ছিল তার।আমার আম্মারও মিয়াভাই বলে একটা আলাদা টান ছিল। আব্বার সঙ্গে ওনার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল। তৎকালীন সিরাজগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যমণি ছিলেন আব্বা। নাটক, সংগীত সম্মেলন, সাহিত্য সম্মেলন সবখানেই আব্বার উজ্জ্বল উপস্থিতি। সেই সঙ্গে নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগার হিসেবে একটা সম্মানের স্থান, আলাদা পরিচিতি ছিল। আম্মার

মিয়াভাই আব্বার এই সৃষ্টিশীল সত্তাকে সম্মান করতেন। আর রাজনৈতিক বিশ্বাস আলাদা হওয়া সত্ত্বেও আব্বার রাজনৈতিক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতেন। যে কারণে তাদের মধ্যে তর্ক হয়তো হতো। কিন্তু তা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব হতোনা।

আম্মার মিয়াভাই আমাকে খুব আদর করতেন। আমি জন্মেছিলাম চৌদ্দই আগষ্ট। বেশি আদর পাবার সেটাই কারণ। পাকিস্তানের নির্মাতাদের একজন ছিলেন তিনি। তার কাছে চৌদ্দই আগষ্ট ছিল পবিত্র দিন। মামা নাকি আমার নাম রেখেছিলেন আজাদী। আমার আব্বা সে নাম রাখেন নি। উফঃ খুব বেঁচে গেছি। না হলে সারাজীবন এ চৌদ্দ আগষ্ট সম্পর্কিত নামের বোঝা বয়ে বেড়াতে হতো।

আব্বা '৭১-এ সিরাজগঞ্জ ছেড়ে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ বার দেখা করতে যান মামার সঙ্গে। মামাকে অনুরোধ করেন আব্বার সঙ্গে ভারতে চলে যেতে। তিনি রাজি হলেন না। কিন্তু আব্বাকে পথের দিশা বলে দিলেন। মামার আসাম, কুচবিহার, রংপুর, এলাকায় অনেক মুরিদ ছিল। তাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে দিলেন। চিলমারীর বন্দর, মোল্লার চর এলাকার বিভিন্ন লোকদের ঠিকানা দিয়েছিলেন। যাদের কাছে বিপদে সাহায্য পাওয়া যাবে। আব্বা অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। যে পাকিস্তান আর থাকবে না। আমরা স্বাধীন হবই। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু তিনি তার পাকিস্তানের স্বপ্নকে ছাড়তে পারলেন না। অথচঅবাক ব্যাপার হলো যে, সে সময়ে আসাদ্দোল্লা সিরাজী একজন প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। অথচ এই সামান্য জিনিসটা কেন বুঝতে পারলেন না কে জানে!

আব্বা মামার কাছ থেকে বিফল মনে ফিরে এলেন ঠিকানাগুলো নিয়ে। আম্মাও খুব দুঃখ পেলেন। মামা পঁচিশে মার্চের পরেও পাকিস্তানের পক্ষ নিলেন বলে। আম্মা বোধ হয় তার মিয়াভাইয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এমন আশা করেছিলেন। কোনো কাজে লেগিছিল কিনা জানি না। তবে আব্বা-আম্মা যুদ্ধের পুরো নয়মাসই মামার জন্য দুঃখ করতেন। এত বুদ্ধিমান একজন ব্যক্তি এমন একচক্ষু হরিণের মতো! ভারতে বসেই আমরা জানতে পারলাম আম্মার মিয়াভাই শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সর্বতোভাবে সহায়তা করছেন ইত্যাদি। এসব খবর শুনলেই আম্মা দুঃখ পেতেন। মনে মনে তার মিয়াভাইয়ের জন্য যে গর্বটুকু অনুভব করতেন তা আর রইল না।

ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতা ঘরের দ্বারে এসে ডাক দিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে রৌমারী ক্যাম্প থেকে দেশের ভেতরে যাচ্ছে। আমির দুলাভাই, আমিনুল মামা, ইসমাইল কাকা, খোকা কাকা সবাই নিজের নিজের দল নিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে চলে যেতে লাগল। দেশের ভেতরে যাবার আগে সবাই আম্মার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আম্মা ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে আম্মার প্রিয় মিয়াভাইয়ের ভবিষ্যৎ

জানতে চাইতেন কি উত্তর পেতেন জানি না। তবে আব্বা একেবারে উদাসীনের ভূমিকায় রইলেন বলেই মনে পড়ে । কখনো কারো কাছেই মামার বিষয়ে কোন কথা বলতেন না।

আব্বা আরও একবার দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করলেন না। যোদ্ধাদের কোন রকম অনুরোধ করলেন না। যুদ্ধের শুরুতে আব্বা মামার শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করেছিলেন । অন্যায়কারীদের সঙ্গ ত্যাগ করে বাস্তবকে মেনে নিতে। কিন্তু তিনি তা করেননি। অবাস্তব পাকিস্তানের স্বপ্ন আর নৃশংস পাকবাহিনীর সঙ্গেই হাত মেলালেন। যার ফল তিনি ভোগ করবেন এ বাস্তবতাকেও আব্বা মেনে নিয়েছিলেন। আব্বার সঙ্গে আম্মার মিয়াভাইয়ের মনের মিল ছিল খুবই। কিন্তু মতের মিল ছিল না। দুজনের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ দু'মেরুর। অথচ দুজনেই শিল্প-সাহিত্য ভালবাসতেন। দুজনেই চেষ্টা করেছেন জনগণের মানবিক উন্নয়নের। কিন্তু একজন তার ভুল বিশ্বাসের খেসারত দিলেন জীবন দিয়ে। অন্যজন আব্বা, স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক হয়ে দেশে ফিরলেন বীরের সম্মান নিয়ে।

যদি কোনদিন মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা হয়, যদি কেন হবেইএকদিন না একদিন। সেদিন এ দুজনের কথা লেখা হবে দুভাবে। একজন বাঙালির জীবনের আশীর্বাদ। যিনি স্বাধীনতা আনতে যুদ্ধ করেছেন। রক্ষা করতে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন । অন্যজন বাঙালির কলঙ্ক অভিশাপ । যাদের কারণে কালিমা লিপ্ত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ।

অথচ এ দুজনের মনের মিল ছিল। কিন্তু আদর্শের, বিশ্বাসের মিল ছিলনা। তাই আত্মীয় হয়েও এরা কখনো আত্মার সম্পর্কের বাধনে বাধা পড়েননি। আম্মার প্রিয় মিয়াভাই, যিনি আমায় দেখলেই বলতেন তুমি আমার মা হবে না শাশুড়ী? শাশুড়ী হলে তোমাকে একটা চুমু দেব। আর মা হলে দেব দুটো চুমু। ছোটবেলায় আমি তার মা হতে চাইতাম। আজ ভাবি এমন জ্ঞানী ছেলের কোন প্রয়োজন নেই । যে জ্ঞান দেশের মানুষের অমঙ্গল ডেকে আনে । তেমন জ্ঞানের সত্যিই কেন দরকার নেই।

একজন মা ও তার ছেলের যুদ্ধ

পাকিস্তানি আমলে যখনই আব্বা জেলে যেতেন বা আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতেন তখন আমাদের দায়-দায়িত্ব দাদা-দাদিকে বহন করতে হতো। বিশেষ করে আর্থিক দায়টুকু তো তাদের ভাগেই পড়তো। আমার দাদা সিরাজগঞ্জের সবচেয়ে নাম করা ক্রিমিনাল ল'য়ার আব্দুস সামাদ মিয়া ছিলেন প্রকৃতই সাদাসিদা। নিজের কাজের বাইরে তার জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল নিজ গ্রাম মুগবেলাই ও তার আশপাশ। সম্পদ বাড়ানো, রোজগার করা এসবেই ব্যস্ত থাকতে ভালবাসতেন। দেশের ভাল করা মানে বোধ হয় তার কাছে নিজের গরিব আত্মীয় প্রতিবেশীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা বোঝাত। দাদির জগতেও সম্পদ ও হিসেব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ দম্পতির এক ছেলে ভীষণভাবে রাজনীতির জগতে ঢুকে পড়ল কি করে কে জানে। সত্তর সালে আব্বা জেলে যাওয়াতে খুব নাজেহাল হলেন দাদা-দাদি। আমাদের দায় তো নিতেই হলো। সঙ্গে মালামাল ক্রোক সামাল দেয়া আব্বার কেসের খরচ জোগানো সবই তাদের করতে হলো। যদিও তাদের নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস তেমন প্রবল ছিল না। কিন্তু এতসব ঝামেলাতে তারা মোটেও বিচলিত হতেন না। '৭১-এর জানুয়ারিতে মারা গেলেন দাদা। মার্চে শুরু হল যুদ্ধ। আমরা সবাই চলে গেলাম গ্রামের বাড়িতে। এর পরে নানা পথ পেরিয়ে ভারতে। আমরা ভারতে যাবার পরেই পাকিস্তানি আর্মিরা আমাদের শহরের বাড়িটাকে ভেঙে লুটপাট করে নিয়ে যায়। এরপর গ্রামের বাড়ি আক্রমণ করে। আমার দাদির প্রাচীন সংসারটা একদিনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে লুটপাট হয়ে যায়। তারপর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গোলাভরা ধান, গোয়ালের গরু, হাস-মুরগিসহ বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়ি চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির সামনের বিশাল-বিশাল আম-কাঁঠালের গাছগুলো পুড়ে

কয়লা হয়ে যায়। '৭১-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল । মাত্র চার মাসের মধ্যে দাদির দুটো বাড়ি, মানে দুটো ভরপুর সংসার শেষ। রাজাকারদের বাড়ি লুটের পর দাদিসহ সবার গোসল করে পরার মত কাপড়ও ছিল না।

আমরা কলকাতা থাকতেই জানি যে বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে। দেশের ভিতরে যারা যেত, ফিরে এসে সব খবর দিত আমাদের । কলকাতা থেকে মাইনকার চরে আসার পরে আরও বেশি করে জানা গেল সবকিছু। স্বাধীনতার পরে যখন আমরা দেশে ফিরলাম তখন প্রায় নতুন জীবন শুরু করতে হল আব্বাদের। দাদির এত শখের গ্রামের সেই বিশাল বাড়িটি কিন্তু আর কোনদিন তৈরি করা হয়নি। দাদা ছিলেন না। স্বাধীনতার পরে আব্বা ও কাকারা শহরে বাড়ি করলেন নিজ নিজ প্রয়োজন মতো কিন্তু দাদির গ্রামের বাড়ি কে তৈরি করবে? পোড়া টিন দিয়ে দাদি কোনমতে দুটো ঘর তুলেছিলেন। আধভাঙা বিল্ডিং তেমনি পড়েছিল । আর বাকি অক্ষত দুটো ঘরে দাদি গিয়ে থাকতেন মাঝেমধ্যে । তারপরে দাদি মারা গেলেন। এখন তো গ্রামের বাড়িতে তেমন যাতায়াত নেই। আম্মার কাছে শুনি মুগবেলাইয়ের বাড়িতে মানুষ সমান উচু জঙ্গল।

আব্বার রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য পাকিস্তানি আর্মি ও রাজাকাররা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। সে জন্য পরিবারের অন্য সদস্যরা আড়ালে আড়ালে নানা মন্তব্য করত । কারণ ধ্বংস করার সময় তো আব্বার আলাদা বাড়িঘর ছিল না। সবই দাদা-দাদির। কিন্তু আমার দাদি কোনদিন এ জন্য কিছু বলা তো দূরে থাক সামান্য মন খারাপও করেননি । বরং অন্যরা কিছু বললে ধমক লাগাতেন। দাদি বলতেন তার ছেলে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখেছে। যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে। সেখানে বাড়িঘর সম্পদের কোন মূল্যনেই। যুদ্ধে তো কত যোদ্ধা জীবন দিয়েছে । আর দাদির গেছে বাড়িঘর, সম্পত্তির ওপর দিয়ে । দাদির কাছে এটা কোন ঘটনাই নয়।

আমার দাদির কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তেমন পড়াশোনাও করেননি । পড়া বলতে নজরুল ও কামিনী রায়ের গান কবিতা । অথচ মূল্যবোধ কত উন্নত ছিল! দাদি এতটাই আধুনিক ছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য দিতে হয় সে কথায় বিশ্বাস করতেন। আর সে মূল্যের জন্য কখনো সামান্যতম দুঃখবোধও কাজ করতে না তার মধ্যে।

আব্বা কিন্তু কখনো তাঁর মাকে দেশ আর রাজনীতি নিয়ে কিছু বলছেন এমনটা দেখিনি। অথচ তিনি যেন কেমন করে সবই বুঝেছিলেন। প্রত্যক্ষ কোন কিছুতে না থেকেও দাদি তার ছেলেকে সব সময় একটা মানসিক সাহস জুগিয়ে গেছেন। সেটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি। দাদি তার সারা জীবনের তিলতিল করে গড়ে তোলা সবই প্রায় হারিয়েছিলেন '৭১-এ। পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যের ভাষায় আব্বার জন্য। কিন্তু দাদি কখনো আব্বাকে দোষি ভাবেননি। বরং গর্ব অনুভব করেছেন বরাবর।

আব্বার রাজনৈতিক জীবনে আম্মার মত তার নিজের মা-বাবাও ছিলেন আশির্বাদ। তাদের অনুপ্রেরণা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু সহযোগিতা ছিল ভীষণভাবে। যে সহযোগিতা আব্বাকে যুদ্ধের ডাক শুনে ঘর ছেড়ে অজানা এক দুর্গম পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করেছিল। দাদি আব্বাকে পরিবারের সবার কাছ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একি কম পাওয়া? আব্বার চলার পথে দাদি হয়তো ফুল বিছাতে পারেননি তবে কাটার আঘাত যেন না পান সে দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছেন। আমার দাদি ছিলেন লক্ষ-কোটি বাঙালির একজন। যারা সংবাদপত্র পড়ে, মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা শুনে, রেডিওর খবর শুনে নয়-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন আপন অনুভব দিয়ে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। স্বাধীনতার স্বপক্ষে নিজেকে দাড় করিয়েছিলেন প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে। যেখানে কোন ফাঁকি ছিল না।

তাদের কী নাম দেব

আজকাল প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের নানা রকম হিসেব নিকাশের খবর পাই। সংসদ, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল। নানা মুনির নানা মত। কে যোদ্ধা আর কে নয় তা নিয়ে হাজারো বিতর্ক চোখে পড়ে সংবাদপত্রের পাতায়। শুনতে হয় পথে-ঘাটে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে এমনকি ঘরোয়া আলোচনাতেও। আমার জানামতে সরকারিভাবেও দুবার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আমার সরকারি কর্মচারি স্বামী বেচারা বিগত চব্বিশ বছরে কখনো মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে ম্রিয়মান হয়েছেন। কখনো কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের সই করা জ্বলজ্বলে একখানা সনদপত্র থাকা সত্ত্বেও দুবার (কমপক্ষে) তালিকায় নিজের নাম লেখাতে সচেষ্ট হতে বাধ্য হয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার মনোকষ্টের একটু আধটু ভাগ আমিও বহন করেছি।

কিন্তু সত্যিই কি মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি করা সম্ভব? আমরা কী ভেবে দেখেছি বারবার এই যোদ্ধা নিরূপণের চেষ্টা সত্যিই দরকার? নাকি চিহ্নিত করা দরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের? হিসেব রাখা প্রয়োজন তাদের, যারা স্বাধীনতা চায়নি। প্রথমে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা মুক্তিযোদ্ধা কাকে বলব? যারা অস্ত্রহাতে শত্রুর সঙ্গে লড়েছিল শুধুই তাদের? নাকি যে কবি কবিতা লিখে, যে গায়ক গান গেয়ে, যে শিল্পী অভিনয় করে, যে খেলোয়াড় ফুটবল খেলে, যে মাঝি দাড় টেনে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এদের সবাইকে মুক্তিযোদ্ধা বলব? আজ যখন মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরি হয় তখন আমার মনে পড়ে সেই মাঝিদের কথা যারা আমাদের উত্তাল যমুনা পাড়ি দিয়ে নিরাপদে ভারতে যেতে সাহায্য করেছিল । আর সিরাজগঞ্জ থেকে বগুড়া, বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জের গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে যেতে যে গরুর গাড়িতে চড়েছি। তার

গাড়োয়ানদের এই ত্যাগকে কি নাম দেব আমি? কি নামে ডাকবো চিলমারীর বন্দরের সেই জনমজুরদের। যারা আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যে? পথের সব বিপদ দুঃখকে যারা বরণ করেছিল হাসিমুখে? আমি আদের কি নাম দেব?

বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ যখন ঘোষণা দিলেন সকলের মতো আমিও খুশি হয়েছি সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোট বোনদের প্রয়োজনে আমার বাবাকে যখন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা নাম লেখানোর ব্যবস্থা করতে ঢাকা আসতে হলো তখন নামহীন যন্ত্রণায় হৃদয় রক্তাক্ত হল। “চেনা বামুনের পৈতা লাগে না” কথাটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো । আমি আবাক হয়ে দেখলাম যে সিরাজগঞ্জ জেলার সবচেয়ে ত্যাগী সংগ্রামী আওয়ামী লীগ নেতা, সিরাজগঞ্জ মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার হাতে গড়া। সেই আনোয়ার হোসেন রতুকেও নাম লেখানোর জন্য নিজে থেকে বলতে হলো অথচ যদি কখনো মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হয়। তবে আগামীদিনের ইতিহাসবিদরা দেখতে পাবেন আনোয়ার হোসেন রতু হলেন সেই মুক্তিযুদ্ধের নেতা । যিনি কলকাতার নিরাপদ নিশ্চিত আরামদায়ক জীবনকে অবহেলায় পিছনে ফেলে পুরো পরিবারসহ যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধে। চলে এসেছিলেন সীমান্তে। যেখানে প্রতিদিন ধ্বনিত হতো মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি যে পরিবারের ক্ষুদ্র সদস্যটির বয়স ছিল মাত্র চার। সেই তাকেই যখন মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নিজের নাম লেখানোর কথা বলতে হল । তখন যুদ্ধকালের সেই আপনজনরা যে নামহীন থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক ।

আমার মা সীমান্তের সেই গ্রামে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন যোদ্ধাদের জন্য । রান্না করা, খাওয়ানো, তাদের শোবার ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড় পরিস্কারের ব্যবস্থা থেকে যোদ্ধাদের প্রেমপত্র গচ্ছিত রাখা । তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনা, মায়ের মমতা, বোনের স্নেহ, ভাবীর ভালবাসা নিয়ে যোদ্ধাদের জন্য সমস্ত সময় বিলীন করা । একে কি নাম দেব আমি? আমার মা সীমান্তে না এসে অনায়াসে কলকাতা শহরে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার গুছিয়ে নিরাপদ জীবন-যাপন করতে পারতেন । যেমন করেছেন অনেকে । অথচ সেই অনেকের থেকে আমার মায়ের জন্য সেটা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল অনেক বেশি । কারণ আমার নানী কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। ও চাকরিজীবী ছিলেন । কিন্তু আমার মা জীবনের সব রং, সব স্বপ্নকে তুচ্ছ করে চলে এসেছিলেন সীমান্তে। যেখানে অনিশ্চয়তা আর লড়াই ছিল প্রতি মুহূর্তে! ক্লান্ত, ব্যথাতুর, যন্ত্রণাকাতর যোদ্ধাদের ভরিয়ে তুলেছিলেন ভালবাসা, মমতা আর শ্রেহ দিয়ে । আমি কি আমার মাকে মুক্তিযোদ্ধা বলব না? নাকি নতুন কোন নাম দেব আমার যুদ্ধদিনের আত্মীয়দের?

সোবহান কাকার হেলিকপ্টার সফর

সময়টা সম্ভবত জুলাই মাস। বর্ষাকাল। সিরাজগঞ্জ শহরে সাজ সাজ রব। মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মত বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিরাজগঞ্জ শহরে শুভাগমন করছেন। আমার বাবা আনোয়ার হোসেন রতু তখন সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। কোথায় হেলিকপ্টার নামবে । কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানো হবে৷ এসব নিয়ে বাবা ক'দিন ধরে মহাব্যস্ত। বাবার কাছে শুনলাম নিউ মার্কেটের মাঠে হেলিকপ্টার নামবে।

বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানানোর জন্য নির্দিষ্ট দিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আম্মা যথাসময়ে সেখানে গেলেন। নিউ মার্কেটের মাঠের চারদিকে আমরা অনেকেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাতে ফুলের মালা। প্রথম শব্দ শোনা গেল। তারপর আকাশে হেলিকপ্টার দেখা গেল। চারদিকে বাতাসের প্রচণ্ড ঝড় তুলে আকাশযানটি মাটিতে নামল এবং আস্তে আস্তে ওটার ঘূর্ণায়মান পাখাটা থেমে গেল। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে গেল। এক্ষুণি নামবেন বঙ্গবন্ধু। অজানা আবেগে শিহরিত হলাম আমি। উন্নত শির ও দৃপ্ত পদক্ষেপে নেমে এলেন হাজার বছরের সেরা বাঙালি। সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হাত তুলে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে করতে এগিয়ে আসছেন তিনি। মুখে তার শিশুর মতো নির্মল হাসি। চোখে অপরিসীম দরদ ও মমতার মোহনীয় অভিব্যক্তি। হাসিমুখে এগিয়ে আসা বাংলার প্রাণপুরুষের দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম আমার বাবা যেখানে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সেখানে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়ালেন। বাবার কাঁধে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিয়ে বাবাকে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। এতো লোকের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বাবাকে কাছে টেনে কথা

বলায় আনন্দ আর কৌতুহলের বিচিত্র এক অনুভুতিতে মন আমার ভরে গেল । আমার মত অনেকের হাত থেকে ফুলের মালা ও তোড়া নিয়ে বঙ্গবন্ধু গাড়িতে উঠে কাজে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু বাবাকে কি বলেছেন? বাবা হেসে বললেন, বঙ্গবন্ধু সিরাজগঞ্জ থেকে আওয়ামী লীগের অফিস পিয়ন সোবহান কাকাকে তার সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়ে যাবার কথা বলেন। একঘন্টার মধ্যে তাকে তৈরি করে হেলিকপ্টারে তুলে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য বাবাকে নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো বাবা সোবহান কাকাকে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়ে এসেছেন। হেলিকপ্টার উড়ে গেছে নীলফামারীর পথে । সিরাজগঞ্জ থেকে একজন মাত্র মানুষ সেদিন বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি আমাদের সবার অতি আপনজন সোহবান কাকা। আওয়ামী লীগের নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী একজন মাঠকর্মী। যিনি পঁচিশ বছর ধরে সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের অফিস পিয়ন হিসেবে সর্বমহলে সুপরিচিত।

বাবার কাছে জানলাম, কিছুদিন আগে সোবহান কাকা তার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা যান। কিন্তু দুদিন চেষ্টা করেও সুযোগ পাননি। অবশেষে হতাশ হয়ে সোবহান কাকা যখন সিরাজগঞ্জে আসবেন বলে ঠিক করেছেন তখন আচমকা বঙ্গবন্ধু বত্রিশ নম্বর রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে সোবহান কাকাকে হেঁটে যেতে দেখে তাকে চিনে ফেললেন। বাংলার মানুষের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রটোকল ভেঙে গাড়ি থামিয়ে রাস্তার ধারে থমকে দাঁড়ানো তার সাধারণ ও একান্ত প্রিয় কর্মীকে তুলে নেন তার নিজের গাড়িতে। নিয়ে যান তার বত্রিশ নম্বর-এর বাসভবনে । বাড়িতে নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছিস? সংসার চলছে কীভাবে?

সোবহান কাকা উত্তর দেন, "ভালোই আছি নেতা, সংসারও কোন রকমে চলে যাচ্ছে।" তখন বঙ্গবন্ধু তাকে বললেন, "কেন এসেছিস বল? "আপনাকে শুধু একবার দেখতে এসেছি, আর কোন কাজ নেই ।" সোবহান কাকা উত্তর দেন গ্রাম-গঞ্জের যে সব নিঃস্বার্থ কর্মীর শ্রম, ঘাম আর অশ্রুর ওপর দাড়িয়ে আছে তার দল তাদেরই একজনকে কাছে পেয়ে বঙ্গবন্ধুর মনে প্রবল ইচ্ছে, তাকে কিছু দেবার। তাই তিনি আবারও কাকাকে জিজ্ঞেস করেন, "কি চাস তুই, বল?' সোবহান কাকা আবারও বলেন, "আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে হলো, তাই চলে এলাম। আর কিছু চাই না।" অবশেষে মনের এক বিচিত্র বাসনার কথা নেতার কাছে ব্যক্ত করেন। বলেন, "নেতা, আমার একবার হেলিকপ্টারে চড়ার খুব শখ।" বঙ্গবন্ধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কাকার দিকে অনেকক্ষণ ধরে পলকহীনভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ঠিক আছে, তোর এই ছোট আশাটা আমি অবশ্যই পুরণ করব। তোকে আমি একদিন হেলিকপ্টারে চড়াব।"

বাংলার প্রিয় শেখ মুজিব ছয়-সাত মাস পরেও তার সিরাজগঞ্জের অতি সাধারণ

একজন কর্মী সোবহান কাকার মনের সেই বিচিত্র অভিলাষের কথা ভুলে যান নি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সোবহান কাকা সিরাজগঞ্জ নিলফামারী হয়ে ঢাকা যান। ঢাকা থেকে পথ খরচ দিয়ে বঙ্গবন্ধু আবার তাকে সিরাজগঞ্জে ফেরত পাঠান। এই হচ্ছে সোবহান কাকার হেলিকপ্টার সফরের ইতিবৃত্ত।

অতি সাধারণ একটি ঘটনা,-কিন্তু তুলনাহীন। অবিস্মরণীয়। প্রায় দিনই সকালবেলা রান্নাঘরে আমাদের সঙ্গে চা-নাস্তা খেতে খেতে সোবহান কাকা যখন তার জীবনের সবচেয়ে এই স্মরণীয় ঘটনাটি স্মৃতিচারণ করতেন। তখন তার চোখে-মুখে যে আবেগ, যে গর্ব, যে তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠতো তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

এখন আর আমার কোন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক অঙ্গনে সোবহান কাকার মতো সৎ, নির্লোভ, ত্যাগী ও আদর্শবান কর্মী আজ কেউ আছে কিনা-তা আমি জানি না। তবে বঙ্গবন্ধুর মত নেতা যে নেই তা বুঝতে পারি আমার ছেলেমেয়ের কথা শুনে।

তাই আমার বারবার মনে হয় - হতভাগ্য এই জাতি অপেক্ষায় আছে সেই মহামানবের। যিনি '৭১-এর মত আবারও জাগিয়ে তুলবেন বাঙালি জাতিকে। হতাশাগ্রস্থ জাতি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সেই দৈব পুরুষের-যিনি পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সোবহান কাকার মতো খাঁটি সোনাকে চিনতে একটুও ভুল করবেন না।

অনির্বাণ দীপশিখা আমাদের সোবহান কাকা

’৭৫-এর পট পরিবর্তন হলো হাঠাৎ বজ্রপাতের মতো। যার সামনে দাড়িয়ে উঁচু গলায় কথা বলার মতো লোক দেশে একজনও নেই বলে ধারণা করা হতো। সেই বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিমর্মভাবে নিহত হলেন ঘাতকের বুলেটে। যারা বুলেট ছুঁড়েছিল তারা এ মাটিরই সন্তান। অভাবিত যে ঘটনা ঘটে গেল, পরিণামে আবারও একবার ভেঙে গেল আমার মায়ের সুন্দর করে গুছিয়ে সংসার করার স্বপ্ন-সাধ। দৃঢ়চেতা বাবার আপোসহীন রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য মা তার বিবাহিত জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছেন অবিরত সংগ্রাম আর সংঘাতের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা মাকে অনেকটা স্বস্তি দিয়েছিল। পনরেই আগস্টের পর আবার তাঁর জীবনের শান্তি স্বস্তি হারিয়ে গেল। শুরু হলো নতুন আর এক সংগাম। স্বাধীনতার পূর্বের আন্দোলন-সংগ্রামে আমার বাবার অনেক সহযোদ্ধা ছিলেন। তখন এদের মধ্যে গভীর আন্তরিকতার বন্ধন ছিল। ছিল একের প্রতি অপরের বিশ্বাস আর ভালবাসা। সেদিন তাদের ওপর নেমে আসা সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে একসঙ্গে ভাগ করে নিতে দেখেছি। কিন্তু পচাত্তর-এর পনেরোই আগষ্টের পর তাদের অনেকেরই অন্য আর এক রূপ বেরিয়ে এলো। সে রূপ বড়ই কদর্য । বহু মুজিবভক্ত রাতারাতি মোশতাকভক্ত হয়ে গেল। বাবার কাছে শুনলাম ইতিমধ্যে চটজলদি সিরাজগঞ্জের দুজন এমপি মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছে। বাবার মত হাতে গোনা কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ও আপোসহীন আওমামী লীগ কর্মী বঙ্গবন্ধুর ঘাতকদের রোষাণলে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেন । তাদের পাশে তখন কোন নেতাই নেই, কোন রাজনৈতিক বন্ধু নেই। কোথাও কোন আশার আলো নেই । চারদিকে শুধুই অন্ধকার ।

সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমার বাবা এককাপড়ে বাড়ি ছাড়লেন। স্বাধীনতার পূর্বে ঘাতকদল ছিল পাকিস্তানি হানাদাররা । এবার ঘাতকদল আমাদের দেশেরই সন্তান। জাতির কি দুর্ভাগ্য!

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে তদানিন্তন সামরিক জান্তার সৈনিকরা আমাদের বাড়িতে তল্লাশির নামে তান্ডবলীলা শুরু করল । বাক্স-পেটরা, আলমারির তালা খোলার সময় না দিয়ে সেগুলো ভেঙে কাপড়চোপড়, কাগজপত্র বের করে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে যেতে লাগল। আমাদের বাড়িতে সামরিক জান্তার রেইড যখন প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়াল তখন মা আর রাত্রিতে আমাকে বাড়িতে রাখতে সাহস পেতেন না।

বিকেলবেলাতেই আমাদের উপেন অধিকারী কাকার বাড়ি কিংবা কোন আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসতেন । আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখন দলের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই আমাদের প্রতি এতটুকু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি । আসতেন শুধু সাধারণ কর্মীরা। তাদের অনেকে খুব ভোরে এসে রান্নাঘরে বসে মায়ের দেয়া চা-রুটি খেতেন । আর বঙ্গবন্ধুর জন্য চোখের জল ফেলতেন। আমাদের নিজেদের সেই মহাবিপর্যয়ের দিনেও মা যাকে যতোটা পারতেন সাহায্য করতেন । বুদ্ধি পরামর্শ দিতেন। মাঝেমধ্যেই খবর পেতাম আর্মিরা কোন একজন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ বা ছাত্রলীগের কর্মীকে ধরে ফেলেছে। যাকেই ধরতো তার ওপরই ওরা অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। পাকিস্তান আমলে এ সব করমীদের জেল জুলুম ও নির্যাতন ভোগের অভিজ্ঞতা কম বেশি সবারই ছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশের সৈন্যরা যে নিজেদের দেশের মানুষের ওপর এরকম নির্মমভাবে অত্যাচার চালাতে পারে-এ ধারণা অনেকেরই ছিল না।

একদিন শুনি, সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, ন্যায়-নীতি ও আদর্শপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা আমির হোসেন ভুলুকে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আর্মি ক্যাম্পে আটক রেখে তার ওপর এমন নিমর্মভাবে নির্যাতন চালানো হলো, যা কিনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাৎসিবাহিনীর নৃশংসতাকেও হার মানায়।

আমার মা আর বোন ছুটে গেলেন তখনকার মহকুমা প্রশাসক ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসকের কাছে। তাদের দুজনই সেদিন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আর্মি মেজরের সঙ্গে অনেক দেন দরবার করেন এবং আমার দুলাভাইসহ কয়েকজন নির্দোষ ও নিরপরাধ কর্মীকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তাদের মধ্যে সোবহান কাকা অন্যতম ।

আমির দুলাভাই যখন ছাড়া পেলেন তখন তিনি মৃতপ্রায়। রুলের আঘাতে প্রায় সবগুলো দাত ভেঙে ফেলেছে। হাত-পায়ের আঙুলের নখের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা সুঁচ ফুটিয়েছে। আঘাতে আঘাতে সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করে ফেলেছে। সেদিন

মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন ভুলুর করুণ দশা দেখে অতি বড় পাষাণের চোখেও পানি এসেছে।

মা আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। ভোরের ট্রেনে ঈশ্বরদী গিয়ে সেখান থেকে সকাল এগারোটার প্লেনে ঢাকা যাব স্থির হলো । মায়ের অনুরোধে প্রশাসনের জনৈক কর্মকর্তা প্লেনের তিনখানা আগাম টিকেট এসে দিলেন। আমার সঙ্গে যাবেন ছোট ফুপা আর বাবার ফুপাতো ভাই শ্যামল কাকা । ঢাকায় আমার এক ফুপুর বাসায় থাকব । সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনের পাশে আমার ছোট ফুপুর বাসা ছিল। ঠিক হলো রাতে তার বাসায় থাকব। ওখান থেকে ভোরে ট্রেনে ঈশ্বরদী হয়ে প্লেনে টাকা যাব । আমার এসএসসি পরীক্ষার তখন মাত্র পাঁচ মাস বাকি।

আপাতত পড়াশুনা বন্ধ, আমি বিস্ময়ে হতবাক! পাকিস্তান আমলে বাবা বারবার জেলে গেছেন। কই তখন তো আমাদের পড়াশুনা কখনও বন্ধ হয়নি। বরং আমরা তখন বেশ গর্বিতভাবে চলাফেরা করতাম। সবাই যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতেন আমাদের। বাবার রাজনৈতিক সহকর্মীরা প্রায়ই আমাদের খোঁজখবর নিতেন।

কোন আর্থিক সহায়তা না লাগলেও যে সহানুভূতি ও সম্মান আমরা পেতাম তার মূল্য অনেক । আর “পচাত্তর-এর পর কি আশ্চর্য পরিবর্তন! দলেরবেশ কিছু নেতার কি বিচিত্র আচরণ!”

সন্ধ্যার পরপরই মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটা পরিচিত রিকশায় রওনা দিলেন বাজার স্টেশনের কাছে অবস্থিত ছোট ফুপুর বাড়িতে । রাস্তাঘাট শুনশান দুই একটা দোকান। বিশেষ করে ওষুধের দোকানগুলোতে আলো জুলছে। তাছাড়া রাস্তার বেশিরভাগই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বড়পুল পার হওয়ার পরপরই হঠাৎ চোখে পড়ল পাশে আওয়ামী লীগ অফিসে কম্পমান একটি আলোর শিখা।

আওয়ামী লীগ অফিসে বিদ্যুৎ নেই। দরজা জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙাচোরা । সবকিছু এলোমেলোভাবে ছড়ানো । নিমিষের মধ্যে আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি, টেবিলের ওপর ছোট্ট একটি মোমবাতি জেলে বিষন্ন মুখে বসে আছেন আমাদের সোবহান কাকা! আওয়ামী লীগের অফিস পিয়ন। বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত । কয়েকদিন আগে আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে দুর্বিসহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি ।

আনন্দ আর ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো । আমি শক্ত করে মায়ের হাত চেপে ধরলাম। মা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন “ভয় কি মা? দেখ তোর সোবহান কাকাকে। খাটি মানুষরা কখনও ভয় পায় না। তারা মৃত্যুর কাছেও হার মানে না।”

জীবনে বহু সমস্যার মাঝেও মনে সাহস এনেছি “পচাত্তরের সেদিনআওয়ামী লীগ অফিসে নিঃসঙ্গ একাকি বসে ছোটখাটো আকৃতির সোবহানকাকার নির্ভীক চেহারার কথা স্মরণ করে।”

একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এসেছে। পুরোনো দিনেরমত যত সব বর্ণচোরার দল আবারো ক্ষমতার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। সোবহান কাকা আজ বেঁচে নেই। কেউ কি এখন মনে রেখেছে সোবহান কাকার মত ত্যাগী ও আদর্শবান কর্মীদের কথা?

আজও আমার মনে প্রশ্ন জাগে-ছোট্ট একটি মোমের অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মত সোবহান কাকা সেদিন কি পাহারা দিচ্ছিলেন? সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগের অফিস, না বঙ্গবন্ধুর আদর্শ?

’৭১-এ চামুসেন লেন

কলকাতার শেয়ালদা ইস্টিশন। সন্ধ্যা উৎরে যাবার পর আমাদের নিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল। কত মানুষ কত মানুষ গিজগিজ করছে। কত আলো, দিনের মত ঝকঝকে। প্লাটফর্মে রেলের ধারে মানুষ আর মানুষের জীবনযাত্রা। ঠিক মনে নেই আর কি দেখেছিলাম। আমার বাবা দুটো ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে তাতে দু'বাড়ির লোকদের ভরে ফেললেন। একটাতে আমরা আর অন্যটিকে সে সময়ের আওয়ামী লীগ এমপি সৈয়দ হায়দার আলীর পরিবার । সৈয়দ হায়দার আলীর সুন্দরী ও খুব ভাল স্ত্রীটি ছিলেন অবাঙালি। মিসেস আলীর বড় বোন আবার তার জা, মানে হায়দার আলীরা দু'ভাই দু'বোনকে বিয়ে করেছিলেন।

যা হোক, চাচীদের কোন আত্মীয় বোধ করি কলকাতাতেই থাকেন। চাচীরা সেখানেই যাবেন।

সৈয়দ হায়দার আলীর বড় ভাই জাফর চাচা তাদের পরিবার নিয়ে চলে গেলেন কলুটোলায়। সম্ভবত কলুটোলাই ছিল জায়গাটার নাম । আমরা গেলাম নারকেলডাঙ্গা। মায়ের কাছে শুনেছি আমার নানী থাকেন সেখানে। আমার নানী কলকাতায় একটা স্কুলে শিক্ষিকা ছিলেন। সম্ভবত সত্তর সালের কোন একটা সময়ে অবসর নিয়েছিলেন । কিন্তু কলকাতাতেই থাকেন।

সরু গলির ভেতরের একটা বাড়িতে ছোট একটা ঘর নিয়ে থাকেন আমার নানী । সেই বাড়িতেই আমার মায়ের জন্ম। মুসলমান পাড়ায় বাস আমার নানীর। অবাঙালি ছোট্ট একটা ঘর। একচিলতে বারান্দা। গলির মুখে ঘোড়ার গাড়ি ছেড়ে হেঁটে সেই বাড়িতে ঢুকলাম। সদর দরজা বরাবর ঘরটাই নানীর । বারান্দায় দাঁড়িয়ে নানী। ছোট খাটো

গড়ন। ধরধবে সাদা থান পরনে । একেবারে বিষাদের প্রতিমূর্তি। বলতে গেলে তার সঙ্গে সেই আমাদের মাঝে নাতি নাতনিদের প্রথম পরিচয়। বিষাদ আর কঠোর ব্যক্তিত্বের আবরনে ঢাকা এক রহস্যময়ী মানবী । যার জীবন আজও আমার কাছে এক অকল্পনীয় বাস্তবতা । অবশ্য সে অন্য গল্প ।

নানীর সেই ছোট্টঘরে আমরা এতজন মানুষ। গুড়ের নাগরী ঠাসা হয়ে বাস করতে লাগলাম। বাড়ির অন্য বাসিন্দারাও খুব ভাল। যাদের আম্মা খালা, খালু, চাচি বলতেন । তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আম্মাকে আপা ডাকত। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে কতজন এলো আম্মাকে দেখতে। কত মেয়েরা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলো আম্মার কথা শুনে । আম্মার সইয়ের দল। আমার মা যখন ওদের সঙ্গে কথা বলত আমি অবাক হয়ে দেখতাম। '৭১-এ কলকাতায় গিয়ে আমি আমার মায়ের ছোটবেলা দেখেছিলাম।

আমরা খুব কষ্ট করে থাকছিলাম এ ঘরটায়। কলকাতায় থাকলে আব্বা সারাদিন-রাত প্রবাসী সরকারের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকতেন। না হলে সীমান্তে থাকতেন । আম্মা নানীর সাহায্যে আমাদের নিয়ে দিন পার করছিলেন। সেই প্রথম আমি দেখলাম দোকান থেকে চা-নাস্তা কিনে খাওয়া যায় । নানী দোকান থেকে চা, ডালপুরী এনে খাওয়াতেন। রুটি কিনে আনতেন। সিরাজগঞ্জের মতো ছোট শহরে তো আর এরকম যখন-তখন দোকান থেকে খাবার কিনে আনা হতো না। কিনতে পাওয়াও যেত না।

একদিন সকালে আব্বা বাইরে গিয়েই ফিরে এলেন । জানালেন ভোলা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে । ভোলা কাকা সিরাজগঞ্জের লোক। ওনার ছোট ভাই খোকন কাকা আব্বার বন্ধু। সিরাজগঞ্জে আমাদের পাড়ায় ওনাদের বাড়ি। সাতচল্লিশের পরে ভোলা কাকা কলকাতায় পাড়ি জমান। পরে ওনাদের ছোট ভাইরাও চলে আসেন । পরিবারের অন্য সবাই সিরাজগঞ্জেই থাকতেন। ভোলা কাকা আব্বাকে দেখেই চিনতে পেরে পথ থেকে ধরে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে । আমার নানীর বাড়ির থেকে চার-পাচ মিনিটের হাটাপথ চামুসেন লেন। সেখানেই থাকেন ভোলা কাকা। আব্বার মুখে শুনে আর আমাদের থাকার অবস্থা দেখে ভোলা কাকা একদিন জোর করে আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটির একটা বড় ঘরে আমাদের থাকতে দিলেন এবং অবশ্যই বিনা পয়সায় । চামুসেন লেনের বাড়িটি ভোলা কাকার কারখানা কাম বাসস্থান। ওনার একটি ড্রাই ক্লিনার্স ছিল । বাড়িটির সামনের অংশের দুটো ঘর নিয়ে থাকতেন ভোলা কাকা ও তার বিশাল সাইজের কুকুর। ভেতরের দিকে একটা ঘর রান্নাঘর আর এক চিলতে উঠোন নিয়ে থাকতেন মাসিমা। তার দুই ছেলে রঞ্জন আর রমেন। মাসিমা নার্সের কাজ করতেন। এ বাড়িতে তার বাস কি সূত্রে তা ঠিক জানি না। মাসিমার রান্নাঘরেই ভোলা কাকার খাবার ব্যবস্থা ছিল। মাসিমার পাশের বড় ঘরটাই আমাদের হলো। এই ঘরটা

কারখানার গোডাউন ছিল । খালি করে আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন । আম্মা বারান্দার এককোণে রান্না করতেন কয়লার চুলা জ্বেলে। পুরোনো কলকাতার এ বাড়িতে আমরা বেশ ক'মাস ছিলাম।

ভোলা কাকা খুব ভালো লোক ছিলেন। অনেক যত্ন করে রেখেছেন আমাদের কলকাতার মতো মহানগরে । তাও আবার '৭১ সালে । আমার মা বাবার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পরম আপনজনের মত । আব্বা যখন সীমান্তে থাকতেন তখনও তিনি আমাদের খোঁজখবর নিতেন।

ভোলা কাকা ছিলেন মোটাসোটা হাসিখুশি ধরনের মানুষ। বিশাল একটা ভুঁড়ি ছিল। আমরা কিন্তু তার কাছে যেতে ভয় পেতাম। কারণ ওনার বিশাল আকারের কুকুর । এ কুকুরটি ছিল ওনার সর্বক্ষণের সঙ্গী । আমার মাকে ভোলা কাকা খুব সুন্দর মিষ্টি করে বউমা ডাকতেন । তার সেই ডাকটি আমার মনে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে গিয়েছে । এখনও আমার মন ভাল লাগায় ভরে যায় সেই ডাকটির কথা মনে পড়লে।

কয়েক মাস পরে আমরা কলকাতা ছেড়ে মাইনকার চরে চলে যাই। ভোলা কাকার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয়নি। কিন্তু আমি ভোলা কাকাকে ভুলিনি। ভুলিনি তার ডাক দেবার মিষ্টি ভঙ্গিটি। '৭১-এর সেই উত্তাল দিনে আমার মা-বাবার সংগ্রামের সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পরম আপনজনের মত। আজও আমাদের ’৭১-এর সাথে জড়িয়ে আছেন ভোলা কাকা । আমার '৭১-এর অংশ হয়ে।

ডাকাতের বাড়িতে দাওয়াত

১৯৭১ সাল। আমার বয়স তখন দশ বছর। কিন্তু বয়স ও সময়ের তুলনায় আমি বোধ হয় অনেকটাই এগিয়ে ছিলাম। আর তার কারণও ছিল। রাজনৈতিক পরিবারের প্রথম সন্তান। অতএব একেবারে ছোটবেলা থেকেই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আমার বাবা সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। '৭১-এর সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বাবা কখনো জেলে তো কখনো আন্ডারগ্রাউন্ডে। আমরা এখানে সেখানে। তাই বোধের দরজা খোলা ছোট থেকেই। আমরা বেড়ে উঠেছি বাংলাদেশ নির্মাণের যুদ্ধকে সঙ্গী করে। যে যুদ্ধ '৭১-এ শুরু হয়ে শেষ হয়ে যায় নি।

’৭১-এর মার্চ মাসে যুদ্ধ শুরু হলো। এপ্রিলের প্রথম দিকে আমরা সিরাজগঞ্জ শহর ছেড়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে বগুড়ার পীরহাটি গ্রামে। সেখান থেকে সিরাজগঞ্জের খাড়ুয়া গ্রামে। সেখান থেকে কান্তনগর। অবশেষে নৌকাযোগে ভারতের পথে। ছোট্ট একটা নৌকাতে পঁচিশ জন ভীত সন্ত্রস্ত বাংলাদেশি।

সাতদিন ধরে অবিরাম চলছে নৌকা। সাতদিন পরে আমাদের নৌকা রাতের মতো ভিড়ল চিলমারীর এক চরে। আব্বা নৌকা থেকে নেমে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন এখান থেকে স্থলপথে ভারতে যাওয়া যায়। মানে হেঁটে যাওয়া যায়। আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন হেটেই ভারত যাবেন।

এই চরে নেমে আব্বার আলাপ হয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে। সেই বৃদ্ধ ভারতে যেতে আমাদের সাহায্য করবে বলে আব্বাকে জানায়। ঠিক হয় নৌকা থেকে নেমে প্রথমে আমরা তার বাড়িতে যাব। আমাদের পৌঁছে দেবার লোক ঠিক করে বৃদ্ধ আমাদের ভারতে যাবার ব্যবস্থা করবে। আব্বা আমাদের নির্দেশ দিলেন খালি হাতে নৌকা থেকে নামতে। কারণ

হাটতে হবে তো। নৌকাতে বসেই আম্মা আমাকে ও আমার ভাইকে বললেন, আমরা তো এখন হেঁটে ভারতে যাব। যদি পথে কোন বিপদ হয় অথবা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই তবে তোমরা আমাদের জন্য দাঁড়াবে না। পালাবে যেদিকে পার। আম্মা তার কথা ভারতে পৌঁছার আগে পর্যন্ত বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন।

আমরা নৌকা থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ধনু মিয়া, সাত্তার কাকা, আমির দুলাভাই সবাই নিজ নিজ অস্ত্র কাঁধে প্রস্তুত। এমন সময় নৌকাতে কে যেন খবর নিয়ে এল যে আমাদের সাহায্য করছেন যিনি তিনি একজন পেশাদার ডাকাত । আজীবন ডাকাতি করেছেন। নৌকাতে ফিসফাস। এখন কি হবে! আমরা কি এই লোকের সঙ্গে যাব? আমার বাবা তার দল নিয়ে যাবেন সিদ্ধান্ত নিলেন । আমরা রওনা দিলাম ।

অনেকটা পথ হেঁটে আমরা বৃদ্ধের বাড়িতে এলাম । গ্রামের নাম ছিল যতটা মনে পড়ে মোল্লার চর । গ্রামের বাড়ি যেমন হয় তেমনি । রাস্তা থেকে উঠে একটা ঘর । যেটাকে বলে কাচারিঘর। একটা উঠান। তারপরে মূল বাড়ি। একটা বড় উঠান ঘিরে বেশ কয়টি ঘর। এর বেশি কিছু আর মনে নেই । আমাদের একটা ঘরে বসতে দিল । ঘরটার অর্ধেক জুড়ে চৌকিপাতা ছিলো মনে আছে। আর সেই রাতে বৃদ্ধের বাড়িতে আমরা ভাত খেয়েছিলাম । বাড়ির দু-একটা বাচ্চা আর মহিলাকে দেখেছিলাম । একটুএকটু মনে আছে। বৃদ্ধ আমাদের জন্য চার-গাচজন লোক ঠিক করে দিয়েছিল। যারা পথ দেখিয়ে আমাদের ভারতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এই বৃদ্ধ নাকি ডাকাতের সর্দার! কি করে বিশ্বাস করি? '৭১-এর সেই সময়ে আমাদের দলে ছিল পঁচিশ জন । তার মধ্যে পাচজন সমর্থ পুরুষ। দুই তরুণ। বাকি সব নারী ও শিশু। দলের প্রায় সবার কাছেই টাকা-পয়সা ছিল। মহিলাদের কাছে অল্পস্বল্প গহনা ছিল। আর ছিল অস্ত্র। রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার । অস্ত্রগুলো সবই সচল। অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজন ছিল। ঠিক তেমনি অস্ত্র পেলে ডাকাতদেরও তো ভালোই হতো। কিন্তু কই, কোন সমস্যা তো হয়নি । বরং কত আদর । কত যত্ন করল । খাবার, আশ্রয়, পথের দিশা, পথপ্রদর্শক সবকিছুর ব্যবস্থা করল । অথচ ডাকাতের সর্দার ছিল জেনে কি ভয়ই না পেয়েছিল আমাদের দলের সবাই।

আমাদের দুরবস্থা দেখে বোধকরি বৃদ্ধের মায়া হয়েছিল। বলেছিল দু- একদিন বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেতে। কিন্তু আব্বা রাজি হয়নি। স্বাধীনতার পর তিন যুগ হয়ে এল প্রায় । আজ যখন সেই সময়ের কথা ভাবি তখন মনে হয় সত্যিই কি মুক্তিযোদ্ধার তালিকার প্রয়োজন আছে? সেই যে বৃদ্ধ, ডাকাতের সর্দার বলে যার অখ্যাতি শুনেছিলাম, সেও তো স্বাধীনতার সূর্যসৈনিকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের সাহায্য করেছিল। আমরা যাদের দলে ধনু মিয়া, আমির হোসেন ভুলু ও আনোয়ার হোসেন রতুর মত মহান মুক্তিযোদ্ধারা ছিল, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সবাই ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক । এ

ছাড়া কিছু জামায়াত রাজাকার। আমার তো মনে হয় তাদের সংখ্যা খুব বড় নয়। অনায়াসে গুনে ফেলা যায়। মুক্তিযোদ্ধার কোন সংখ্যা নেই । ’৭১ সালে এই দেশের রান্নাঘর থেকে টিভি ভবন অবধি ছড়িয়ে ছিল মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ। আর এই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল এক বৃদ্ধ । যাকে লোকে বলেছিল ডাকাত সর্দার । ভালো-মন্দ, গ্রাম-শহর, শিক্ষিত-নিরক্ষর সব মানুষ মিলেছিল একমন্ত্রে

> “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম । এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার
> সংগ্রাম।”

আজ বারেবারে মন খুঁজে ফেরে সেই বদলে যাওয়া মানুষ । '৭১-এর বাঙালি।

’৭১-এর কলকাতা : আমাদের সুখ-দুঃখ

মহানগর কলকাতায় আমরা শরণার্থী ছিলাম। আমার মা-বাবার বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ। তার সাথে বোধ হয় কিছুটা আর্থিক অনটনও ছিল। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। কলকাতায় আমাদের জীবনযাপন ছিল বেশি রকমের সাধারণ। আমার মা তার মধ্যেই যতোটা সম্ভব বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন।

আম্মা সকালের নাস্তা বানাতে বসতেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে। রুটি ভেজে তাতে এক টিমটি ডালডা রেখে দিতেন হাত দিয়ে। বলতেন-দেখ এই তো পরোটা হয়ে গেল। সব বেলায়ই এরকম আর কি। আমরা চার ভাই বোন কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। এমন কি ছোট বোনেরাও কখনো আমার মাকে বিরক্ত করেনি। আর কলকাতা বাসের সেই চারমাসও আমরা তো একা থাকছিলাম না। সবসময় হয় যোদ্ধা হয়তো নতুন কোন শরণার্থী থাকত। সবার খাবার ব্যবস্থা করতে আম্মার তো হিমশিম অবস্থা ছিল।

এত সবের মধ্যেও মাঝে মাঝে আব্বা-আম্মা আমাদের এদিক সেদিক বেড়াতে নিয়ে গেছেন। বিড়লা প্লানোটরিয়াম, ইডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট, হাওড়া ব্রিজ। তেমনি একদিন আমরা গেলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নতুন জামা-জুতোয় সেজে। হ্যাঁ নতুন জামা-জুতো কিনতেই হয়েছিল আব্বাকে। কারণ আমরা শরণার্থী হয়ে এসেছিলাম একেবারে এক কাপড়ে। খালি পায়ে। নতুন কাপড় না পাওয়া অবধি আমাদের দলে কারোর গোসল করারও উপায় ছিল না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে আমি তো অবাক। এত বড় দালান। আর এত বড় বড় মর্মর মূর্তি। এখনও মনে আছে দুটো জিনিস। একটা হলো দু রাজকর্মচারির মূর্তি। সম্ভবত ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের মূর্তি দেখিছিলাম। সুপুরুষ দুটো মর্মর মূর্তি আমার

ভাল লেগেছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া মূর্তি দেখে মনে হয়েছিল রাণী কিন্তু দেখতে ভালো না কেন?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গিয়ে হলো এক কাণ্ড। আমরা চার ভাইবোন,আব্বা-আম্মা, মায়া আপা, দুলাভাই সবাই একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভেতরে। বেশ খানিক পরে আব্বা খেয়াল করলেন আমার ছোট বোন অনিতা নেই। অনিতার বয়স তখন পাঁচ। এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন আব্বা আম্মা । দোতলা একতলা সব খোঁজা শেষ । কোথাও নেই । আম্মা-আব্বার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা । সবাই মিলে হায়হায় করে উঠল। দেশের মধ্যে এত বিপদ পার করে বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে মেয়ে হারিয়ে গেল।

সব খুঁজে আমরা হতাশ । সবাই নিচে নেমে এলো । হঠাৎ আব্বা দেখেনদরজায় পাহারাদারের কাছে চুপটি করে বসে আছে অনিতা । তাদের সবচেয়েসুন্দর আর শান্ত সন্তান। সবাই দৌড়ে গেটের কাছে গেলাম । পাহারাদারজানাল আমরা ভেতরে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিতা দলছুট হয়ে যায় ।ও একা একা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরে চলে যাচ্ছিল আমাদের খুঁজতে । তখন পাহারাদার ওকে নিজের কাছে বসিয়ে রাখে । সে বুঝতে পেরেছে যে আমরা জয় বাংলার লোক । তখন বাংলাদেশের শরণার্থীদের “জয় বাংলার” লোকই বলা হতো । আমার মা-বাবা তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

অনিতা এখন একজন পরিপূর্ণ মানুষ । সেদিন সেই পাহারাদার যদি ওকে নিজের কাছে বসিয়ে না রাখত তবে কত কি হতে পারত। ভাবলে শিউরে উঠি। মহানগর কলকাতায় কি আর হারানো মেয়ে খুজে পাওয়া সম্ভব হতো আমার মা বাবার অবাঙালি সেই মানুষটি আমাদের যে উপকার করেছিল ভাবলে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায়। '৭১-এর সেই ভয়াবহ সময়ে কতজনের কাছে উপকৃত হয়েছি আমরা। কতো কৃতজ্ঞতা জমে আছে। সেই সব খণ। সেই সব কৃতজ্ঞতা জমে রয়েছে আমার অন্তরে। যা শোধ করার কোন উপায় নেই শুধু অন্তরে কৃতজ্ঞতা লালন করা ছাড়া। আমি সেই খণ, সব কৃতজ্ঞতা দিয়ে যেতে চাই আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য।

আমার যতদূর মনে পড়ে সেদিন ভিক্টোরিয়া থেকে বের হয়ে আব্বা মামা আমাদের চার ভাইবোনকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছবি তুলেছিলেন স্টুডিওতে গিয়ে। ইভা ছবিতে নেই। কারণ আমার দশ মাস বয়সি এই বোনটি দেশেই রয়ে গিয়েছিল আমার মেজমামির কাছে। আর ছোট বোনটির জন্ম স্বাধীন বাংলাদেশে । কলকাতার স্টুডিওতে তোলা সেই গ্রুপ ছবিটি সম্ভবত আমাদের প্রথম গ্রুপ ছবি। ছবিটি তোলার সময় আমার মা-বাবা হয়তো জানতেন না কতদিন যুদ্ধ হবে? দীর্ঘস্থায়ী ও আজীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন তারা। প্রস্তুত ছিল আমাদের জাতিও। তাই এ ছবিটা সেই সময় তাদের কাছে খুব মুল্যবান ছিল।

যুদ্ধ আর মৃত্যুকে সঙ্গী করেও ছেলেমেয়ের জন্য একটা স্মৃতি রাখতেই বোধ হয় ছবিটা তুলেছিলেন।

লেখক পরিচিতি

মিতালী হোসেনের জন্ম ১৯৬১ সালের ১৪ অগাস্ট সিরাজগঞ্জ শহরে। বাবা আনোয়ার হোসেন রতু, মা সৈয়দা ইসাবেলা, স্বামী খন্দকার মোজাম্মেল হক, পুত্র খন্দকার অমিতাভ নোবেল, এবং কন্যা মৌটুসী খন্দকার। মিতালী হোসেন শৈশবের দুরন্ত সময়ে দেখেছেন রাজনৈতিক উত্তাল পটপরিবর্তন, দেখেছেন মুক্তিযুদ্ধ এবং নতুন মানচিত্র ও নতুন পতাকা। তখন থেকেই জন্ম নিয়েছে দেশের প্রতি, অকুতোভয় বীর সূর্যসন্তানদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। লেখক তার সহধর্মীর জাতিসংঘের চাকুরীর সুবাদে ভ্রমণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সহ অনেক দেশ। স্বাক্ষী হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের অবসান, কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধ, সার্বিয়ার দেশভাগ সহ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার। তিনি তাঁর সেসব মূল্যবান ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে অসংখ্য ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। মিতালী হোসেন বর্তমানে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এবং প্রবীণ বান্ধব বাংলাদেশ সংস্থার নীতি নির্ধারণী পদে কাজ করছেন।